শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণের দাম্পত্যজীবন

সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল

প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স
৬১, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

উৎসর্গ

ভারতের ভবিষ্যৎ, নূতন জাতি ও সমাজের দেবাদিষ্ট অগ্রদূত রূপে যাঁরা হৃদয়ে-হৃদয়ে সাড়া পাইয়া, যুগধর্ম্মের অনুধাবনে ব্রতী হইয়াছেন—

যাঁরা প্রেম ও মিলনের মধুরাগিণী কণ্ঠে নিত্য সম্বন্ধের তীর্থ-যাত্রী—ঐ দিক্-চক্রবালের স্বর্ণবর্ণ স্বপ্নরেখা জীবনে সিদ্ধ করিতে কাতারে-কাতারে ছুটিয়া আসিতেছেন—

সেই অসংখ্য নরনারী, ত্যাগব্রতী তরুণতরুণীর হস্তেই এই পবিত্র প্রসঙ্গ সস্নেহে উৎসর্গ করিলাম।

যুগদেবতার কল্প-স্বপ্ন তাঁহাদেরই জীবন দিয়া সার্থক হউক।

"ওঁ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ"

*

প্রথম সংস্করণের নিবেদন

আমরা পঞ্চম বর্ষ বয়সে, বাংলার নবযুগধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাত্রী মহাদেবী শ্রীমাকে চতুর্ব্বিংশতি বৎসর বয়স্ক যুবকের সহিত উদ্বাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে দেখি—নিরক্ষর ব্রাহ্মণ অশিক্ষিতা পল্লী-বালিকার জীবন কি ভাবে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা চক্ষের সম্মুখে উজ্জ্বল পবিত্র ঘৃত-প্রদীপের মত নারী-জীবনের আদর্শটিকেই কেমন করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছে, ভাবিলে জগৎ স্তম্ভিত হইবে। স্বামীর ধর্ম্মরক্ষার জন্য হিন্দু নারী যৌবনের উচ্ছ্বাস-প্রবৃত্তির অবহেলে মোড় ফিরাইয়া দেয়। নারী-জীবনের সার্থকতা যে সন্তান-মুখদ. .ন, যে নারী তাহা হাসিমুখে বিসর্জ্জন দিতে পারে, প্রেমের জন্য প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিয়া পূত সংযমে জীবন পবিত্র করে, সে নারীর আদর্শ-প্রতীক যুগে-যুগে ভারত-ক্ষেত্রেই আবির্ভূত হইয়াছে। ভারত তাই নারী-ধর্ম্মের মহা-তীর্থ। নারী—সমাজের উন্নতি, শ্রী, শোভার লক্ষ্মীমূর্ত্তি। নারী-জীবনে পবিত্রতা-রক্ষার উপায়—পতির আনুগত্য; তাই সে সহধর্ম্মিণী। এখানে সন্তান-জন্মরোধের জন্য পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিক উপায় আবিষ্কার করিতে হইবে না, স্বামীর প্রয়োজনে কি অফুরন্ত আনন্দের সহিত পত্নী ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন করে, তাহা হিন্দু-গৃহে আশ্চর্য্য কথা নয়। শ্রীমার পবিত্র জীবনের আদর্শখানি সম্মুখে রাখিয়া, আমরা বলিতে পারি—এমন অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও অনুরাগভরে আর কোন্ দেশের নারী পতিকে ভাগবতপরায়ণ করিয়া তুলিবার ব্রত গ্রহণ করিয়া **মর্ত্ত্যে অমর আদর্শ রক্ষা করিতে পারে?**

শ্রীমা যে মুহূর্ত্তে বুঝিলেন—তাঁহার স্বামী ভগবানের প্রেমে উন্মাদ, তাঁহার দেহ-চেতনা নাই, শরীরভোগের স্পৃহা নাই, সেই মুহূর্ত্তে

কোন অভাবনীয় অকল্পিত জগৎ হইতে দুর্জ্জয় শক্তি অবতরণ করিয়া, তাঁহার হৃদয়মন তদ্‌ভাবে গড়িয়া তুলিল—তিনি জীবন-ভোর স্বামি-সম্ভোগ-বাসনায় আর কাতর হইলেন না! এই দেব-দুর্ল্লভ জীবনের অপার্থিব শিক্ষা—আজ ভারতের বুদ্ধিবিপর্য্যয়ে, স্বভাবজীবন-প্রবাহে ভাসিয়া যায়, উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত জাতির চেতনার স্তর মোহ-চঞ্চল ও আত্ম-প্রতিষ্ঠাহীন বলিয়া আমাদের লক্ষ্যের মধ্যেও আসে না, ইহার চেয়ে দুরবস্থা আর কি ঘটিতে পারে? এই যে দেবদম্পতি সম্মুখে অমৃতময় জীবন যাপন করিয়া কালের কোলে অন্তর্দ্ধান করিলেন—আমাদের কয়জন তাহার মর্ম্ম তলাইয়া বুঝিল? কয়জন সে শিক্ষা অন্তর দিয়া গ্রহণ করিল? পতিত্বের মধ্যে সম্ভোগ-বৃত্তি না রাখিয়াই পত্নীর হৃদয়ে কেমন করিয়া প্রেমের পরিপূর্ণ সুবর্ণ-ঘট স্থাপিত হইতে পারে, সে দিব্য জীবনের কৌশল কয়জন অনুসন্ধান কারল? আয়ত্ত করিল?

শ্রীমার জীবন—অসাধারণ বলিয়া হিন্দু নারীর কাছে দুর্ব্বোধ্য নহে। পতিপত্নীর নিত্য মিলনের আদর্শ হিন্দুর নিকট কাল্পনিক, অবান্তর পরিকল্পনা নহে। হিন্দুর ধাতু ভাগবত। নারী-পুরুষের সাধ্য বস্তু—বিশুদ্ধ ভাগবত প্রেম ও আনন্দ। যুগে-যুগে এই ভাগবত প্রেম ও আনন্দের তীর্থরচনায় জীবন বলি দিতে হিন্দু কুণ্ঠা প্রকাশ করে নাই। আজও যে সকল নরনারী দিব্য জীবন ও সম্বন্ধের উপর ভিত্তি করিয়া একটা দিব্য সমাজ ও জাতি সৃষ্টি করার তপস্যায় আত্মনিয়োগ করিতে চায়, তাহাদের নিকট শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমার এই পুণ্য-চরিত-প্রসঙ্গ আলোচনা জীবনের দিগ্দর্শননির্ণয়ে বিন্দু পরিমাণেও সহায়তা করিতে পারে, সেই ভরসায় এই নিবন্ধগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম। জাতির ভবিষ্যৎ ইহার মর্ম্ম প্রণিধান করিলেই শ্রম সার্থক মনে করিব।

আলোচনা-প্রসঙ্গে ঠাকুরের জীবনের ঘটনাবলী ও চরিত্র-পরিচয়ের জন্য গ্রন্থকারকে প্রধানতঃ নির্ভর করিতে হইয়াছে—৺সারদানন্দ মহারাজজীর অপূর্ব্ব মহাগ্রন্থ—"শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা-প্রসঙ্গের" উপরেই; তজ্জন্য সেই প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মার উদ্দেশে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি। উদ্ধৃতাংশগুলির পত্রাঙ্ক উল্লেখ করিয়াছি—"সাধকভাব" ১৩২০, "গুরুভাব" (পূর্ব্বার্দ্ধ) ১৩১৮ ও "গুরুভাব" (উত্তরার্দ্ধ) ১৩১৮ সালে প্রকাশিত প্রথম সংস্করণ হইতেই, ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন হইতে পারে। শ্রীশ্রীঠাকুরের পুণ্যাত্মা ভক্তমণ্ডলী আমাদিগকে চিত্রাদি উপকরণদানে এই গ্রন্থ-প্রকাশে যথোচিত সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদেরও নিকট আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

*

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

দীর্ঘকালের ব্যবধানে পুস্তকখানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইলেও, ইহার বক্তব্যের তাৎপর্য্য যাহা তাহার সময়োপযোগিতা নষ্ট তো হয়ই নাই, বরং আজিকার আচ্ছন্ন যুগ-চিত্ত-মানসে শুদ্ধ সমাজ-সংগঠনের ইঙ্গিত বহন করিয়া আনিবে। বর্ত্তমান সংস্করণে পুস্তকের বিষয়-বস্তুর কোন পরিবর্ত্তন-পরিবর্জ্জন করা হয় নাই, কেবল সূচনা-পর্ব্বের সজ্জার কিছু অদল-বদল করা হইয়াছে মাত্র।

*

ভূমিকা

ঠাকুরের জীবন—ভবিষ্যতের আলো। দক্ষিণেশ্বরে তাঁর শ্রীমুখে যে যুগধর্ম্মের মহামন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহা প্রত্যক্ষভাবে কাম-কাঞ্চন ত্যাগের ঋক্ হইলেও, সত্যের উহা একটা দিক্ ; অপর দিক্‌টা এখনও সম্পূর্ণ ধরা পড়ে নাই—সে দিক্‌টা ঠাকুরের কথা নয়, তাঁর জীবন। সিংহ-বীর্য্য স্বামী বিবেকানন্দ ঠাকুরের সাধনার যেমন একটী অভিব্যক্তি, কাম-কাঞ্চন ত্যাগের হোমকুণ্ড জ্বালিয়া শুক সনাতনের পবিত্র আদর্শ জাতির জীবনে সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তেমনি ঠাকুরের জীবন-সাধনার অন্যতম প্রকাশ বীজ-রূপে স্থান পাইয়াছিল সাধু নাগমহাশয়ের জীবনে—সেখানে একটা কৃচ্ছ্রসাধ্য প্রয়াসরূপে ইহা ফলিবার উপক্রম হইলেও, জাতির জীবনে সেরূপ প্রয়াসেরও আবির্ভাব নিরর্থক নহে। প্রকৃতির বুকে একবার যে ঊর্দ্ধগতির বীর্য্য স্থান পায়, তাহা একক ব্যষ্টি-মূর্ত্তিতে নিবদ্ধ থাকিবার জন্য নয়, একটা শৃঙ্খল রচনা করিয়া কালে তাহা সমষ্টির ব্যাপক-জীবনে সম্প্রসারিত হইবেই, ইহা অবধারিত। কামকাঞ্চনের মধ্যে থাকিয়াই কামকাঞ্চন-শুদ্ধির ব্যবস্থা জাতি যদি আজ কোথাও হৃদয় দিয়া গ্রহণ করিয়া উদ্বুদ্ধ হয়, ঠাকুরের অনাহত আশীর্ব্বাদ সেইখানেই মূর্ত্ত হইয়া উঠিবে।

বাঙ্গালীর চরিত্রে আজ এই দিক্‌টা পরিস্ফুট করিয়া তোলার দিন আসিয়াছে। জাতি ও সমাজ—খাপ-খোলা তলোয়ার সন্ন্যাসীরই সমষ্টি নহে। সমাজের প্রতিষ্ঠা—দিব্য সম্বন্ধময় জীবনে। ভোগের ঊর্দ্ধে এই নিত্য সম্বন্ধ-তত্ত্বের আবিষ্কার—সমাজ-সাধনারই মূলগত লক্ষ্য। শ্রীশ্রীঠাকুর এই সাধনারই অগ্রদূত, ইহা বলিলে বোধ হয়

অত্যুক্তি হয় না। প্রত্যেক পুরুষ কি নারী, ঈশ্বর-সাধনায় যারা আত্মসমর্পণ করিয়াছে, তাহাদের জীবনে চিরসঙ্গী ও সঙ্গিনীর সাক্ষাৎকার অসম্ভব নহে। দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর কামকাঞ্চনবিরাগী হইয়াও, স্বেচ্ছায় স্বপত্নীর সন্ধান পাইয়া বিবাহ করিয়াছিলেন। পূর্ণাঙ্গ জীবনের সাধনায় এ বিবাহের প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। জীবনকে খণ্ড করিয়া দেখিলে, আমরা জীবনের মাপে অনেক অসম্পূর্ণ আত্মবিকাশকে দোষ ও ত্রুটির হিসাবেই দেখি; কিন্তু জীবনপ্রবাহের অনন্তত্ব যার অনুভূতির মধ্যে ফুটিয়াছে, সে তার অভেদ সম্বন্ধ-তত্ত্বকে ছাড়িবে কেন? ঠাকুরের জীবন যুগ-ধর্ম্ম-সাধনে অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য-মূর্ত্তি; কিন্তু তবুও তিনি স্ত্রী গ্রহণ করিলেন। কাল-ধর্ম্ম অপেক্ষা কালাতীত ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। পুরুষ-প্রকৃতির মিলন—সৃষ্টিলীলার মূল-তত্ত্ব। সত্যান্বেষী তুরীয় জীবনের ক্ষেত্রে যে বস্তুর সাধন-নিরত সেখানে তার চির-সঙ্গিনী যদি তাহাকে সাহায্য করে, তবে সে পরিপূর্ণ তৃপ্তি লইয়াই সে কার্য্যে আত্মনিয়োগ করে। শান্তি ও আলোয় তার সবখানি ভরা থাকিলে, জীবন শক্তিপূর্ণ হয়। নারী-পুরুষের মিলনের মধ্যে রিরংসার তাড়না থাকিতে মিলনের মধুস্বাদ বরং ক্ষুণ্ণ হয়। যেখানে কাম-কুক্কুরের লেলিহান রসনা নাগাল পায় না, সেইখানেই জগতের দান বিশুদ্ধ মূর্ত্তিতে ফলিতে পারে।

প্রশ্ন উঠে—যে বিবাহে নারীপুরুষের রক্তমাংসের সম্বন্ধ নাই, সে বিবাহের প্রয়োজন কি? ইহার উত্তর দিতে গিয়া, জাতি-ধর্ম্মের প্রতীক মহাত্মা গান্ধীও বিব্রত হইয়াছিলেন, শুনিতে পাই। সমাজ-বিধানে পরিণয়-নীতি সমাজপুষ্টির অপরিহার্য্য ব্যবস্থা, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়; যেখানে ইহার অভাব, সেখানে পরিণয় অর্থহীন। কিন্তু সত্যধর্ম্মের সাধনায় যে জাতি গড়িয়া উঠিবে, তাহার ভিত্তি যদি

অপূর্ব্ব সংযমের উপর ভর দিয়া না দাঁড়ায়, তাহার ভবিষ্যৎ নিঃসংশয় নহে। একেবারে জাতির মূলে এইরূপ অপার্থিব সংযমের বনিয়াদ গড়িয়া তুলিতে পারিলেই, প্রবৃত্তির টানে সে জাতি আর কখনও অধোগামী হইবে না।

এই সংযম কৃচ্ছ্রতামূলক আদর্শের দায় হইলে, আমরা বিব্রত হইব, লক্ষ্যভ্রষ্ট হইব। এখানে কৃচ্ছ্রতার কোন কথা নাই। সাধনার অমৃত-পরশে জীবন ভরাইয়া, যুগধর্ম্মসাধনে আমার সত্য জীবন-সঙ্গিনীর আনুকূল্য হিতকর হইবে। বরং জীবনের এই সত্যটাকে অস্বীকার করিয়া চলায়, একটা ক্ষুণ্ণতা অজানা ভাবে প্রতি পদে আঘাত দিতে থাকে। দেশে নিঃসঙ্গ জীবনের সংখ্যা বড় অল্প নয়; কিন্তু তেমন বিদ্যুচ্ছক্তি-বিচ্ছুরণের অবকাশ জীবনে কেন ঘটে না, তার কারণ অন্বেষণ করিলে শতকরা নব্বই জনের মধ্যে বোধ হয় এই সত্যই আবিষ্কৃত হইয়া পড়িবে।

যুগধর্ম্মের সন্ধান যাহারা পাইয়াছে, জাতির জীবনে সত্যনীতির আবিষ্কার ও অধ্যাত্মবলবিধানের ভার তাহাদেরই গ্রহণ করিতে হইবে। নারীপুরুষের মিলন সত্যই যদি অধ্যাত্মদর্শনের ভিত্তি ধরিয়া সাধিত না হয়, সমাজে ব্যভিচার নিবারণ করা সম্ভবপর নহে। নারী যদি তার অভেদ-স্বরূপ পুরুষ ও পুরুষ যদি তার সত্য-সঙ্গিনী নারীর সন্ধান পায়, নারী অথবা পুরুষ কখনও সমাজ-সঙ্কর-দোষে আত্মঘাতী হইবে না। কিন্তু শুধু স্বাধীনভাবে নারী বা পুরুষ পতি ও পত্নী-নির্ব্বাচনের অধিকার লাভ করিলেই যে ইহা হইবে, এমন কথা আমরা বলি না—ইউরোপীয় সমাজে তাহা হইলে প্রতিদিন পতিপত্নী-ত্যাগের আবেদনপত্র হস্তে ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত হইত না?

মানুষকে অন্ধ করে—কাম। ভারত চাহিয়াছে—এই আত্মকামের

শোধন ও নবজন্ম। আত্মশুদ্ধি হইলেই দিব্য দৃষ্টি ফুটে ; ইহা অলৌকিক ব্যাপার নহে। সত্যসঙ্কল্পপরায়ণ ব্যক্তি যদি দ্বাদশ বর্ষ কায়িক, বাচিক, মানসিক, ত্রিবিধভাবে সত্যের সাধনা করে, শাস্ত্রে বলে—তার মনে মিথ্যা কল্পনার পর্য্যন্ত উদয় হয় না, তার ভাবে, চিন্তায়, ভাষায় সত্যই ব্যক্ত হয়। নিষ্কাম উৎসর্গ-যোগীর অন্তরে যে দৃষ্টি ফুটে, তাহা যে তার অন্তরের সত্য অভিব্যক্তি, সে বিষয়ে সংশয় নাই। ভারতের নর-নারী উৎসর্গ-সাধনায় যেদিন উদ্বুদ্ধ হইবে, যেদিন তাহাদের সত্যদৃষ্টি ফুটিয়া উঠিবে, সেদিন সমাজে, শিক্ষায়, জীবনের সর্ব্বাবস্থায় একটা দিব্য ছন্দঃ ও শৃঙ্খলার সৃষ্টি হইবে। সেদিন জাতি-বর্ণ-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে মানুষ নিজের ধন নিজেই বাছিয়া লইবে ; পাইয়া আর হারাইতে হইবে না—যাহা হইবে তাহা অব্যর্থ ও সনাতন।

*

দুই রকম 'আমি' আছে—একটা পাকা 'আমি' আর একটা কাঁচা। আমার বাড়ী, আমার ঘর, আমার ছেলে—এগুলো কাঁচা 'আমি'; আর পাকা আমি হচ্ছে—আমি, সেই নিত্যমুক্ত জ্ঞানস্বরূপ। * * যখন বাহিরে লোকের সঙ্গে মিশবে, তখন সকলকে ভালবাসবে—মিশে যেন এক হয়ে যাবে—বিদ্বেষ ভাব রাখবে না। * * আর নিজের ঘরে গিয়ে শান্তি আনন্দ ভোগ করবে। জ্ঞানদীপ জ্বেলে ঘরে ব্রহ্মময়ীর মুখ দেখো। নিজের ঘরে স্বরূপকে দেখতে পাবে। রাখাল যখন গরু চরাতে যায়, গরু সব মাঠে গিয়ে এক হয়ে যায়—এক পালের গরু। যখন সন্ধ্যায় ঘরে যায়, আবার পৃথক হয়ে যায়। নিজের ঘরে 'আপনাতে আপনি থাকে'।

শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণের দাম্পত্যজীবন

॥ ১ ॥

বাংলার সাধনা—তন্ত্র ও সহজিয়া। জীবন লইয়া খেলা, কল্পনার স্থান নাই। বাঙ্গালী সিদ্ধ জীবনের আদর্শ দিতে চাহিয়াছে, ইহা বেদ-বিধি ছাড়া নূতন সাধনা, জীবনকে সিদ্ধ ও দিব্য করিয়া বাঙ্গালী জগতে একটা নূতন সভ্যতা রচনা করিতে চাহে। তাই বাঙ্গালীকে বুঝিতে হইলে, নান্নুর, কেন্দুবিল্ব বুঝিতে হয়, নবদ্বীপ, হালিসহর ও দক্ষিণেশ্বরের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে হয়। বাঙ্গালীর জীবন-তীর্থ বাংলায়। কাশী, কাঞ্চী, মিথিলা, প্রভাস, বৃন্দাবন—ভারত সভ্যতার তীর্থ। বাঙ্গালী নিজের বৈশিষ্ট্য হারাইয়া এই জীবন-তীর্থগুলির সম্যক্ মহিমাবধারণে এখনও অক্ষম—ইহা আত্মবিস্মৃতির লক্ষণ। মেষপালিত সিংহশিশু নদীজলে স্বীয় প্রতিবিম্ব দেখিয়া যেমন সদম্ভে গর্জ্জন তুলিয়াছিল, তদ্রূপ বাঙ্গালী আপনাকে যেদিন দেখিতে শিখিবে, সেদিন সে স্বরূপের গর্ব্বে আত্মপ্রতিষ্ঠা পাইবে। কেবল প্রত্নতত্ত্ববিদের হাতে এ ভার ছাড়িয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না, আত্মতত্ত্ব আবিষ্কার করিতে হইবে—সাধনার মধ্য দিয়া। আবার বলি, সে সাধন—তন্ত্র, সহজিয়া।

আধুনিক যুগের অন্তঃসারশূন্য নীতি ও সভ্যতার বালুস্তূপে ভিত্তি করিয়া, তন্ত্র-সহজিয়া সাধনার কথা শুনিলেই বিস্ময়ে ঘৃণায় একদল লোক শিহরিয়া উঠেন। বলা বাহুল্য, বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য কিন্তু অতীতের এই অপূর্ব্ব সাধনতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত।

কামকাঞ্চনত্যাগের মন্ত্র যাঁর জীবনের প্রতি ছন্দে ঝঙ্কার দিয়া উঠে, তাঁর দাম্পত্যজীবন লইয়া কথা ধৃষ্টতা বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু যে তরুণ জাতি ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হইতে চাহে, তাহাদের জীবনসমস্যা যে ইহাই। শুধু মন্ত্র, শুধু উপদেশ দিয়া সমস্যার মীমাংসা হয় না। তিলে-তিলে যেখানে জীবনক্ষয় হইতেছে—তাহা হইতে পরিত্রাণের পথ ঠাকুরের দাম্পত্যজীবনের রহস্য উদ্ভিন্ন করিয়াই আবিষ্কৃত হইবে। তাই ঠাকুরের পুণ্যস্মৃতি মনে করিয়া, তাঁর এই অসাধারণ জীবনচরিত্রের ক্ষুদ্র অধ্যায়টুকুর আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তাঁর কথা তিনিই যখন লিখাইয়া লন—তখন ভয়ে লেখনী আড়ষ্ট হইবে কেন?

জীবন শ্রীভগবানের ভোগ ও অধিকারের ক্ষেত্র, কোন্ মার্জ্জিত-বুদ্ধি তরুণ এ কথা অস্বীকার করিবে? কিন্তু বস্তুতঃ কি ঘৃণ্য কুৎসিত জীবনভার বহিয়া চক্ষে যে অশ্রু ঝরে, তাহা আর বলিবার নয়! কামনার দায়েই অমৃতের পরিবর্ত্তে হলাহল সেবন করিতে হয়, কাম-কাঞ্চনত্যাগের মন্ত্র জীবনের পথে সমস্যাই বাড়ায়, মীমাংসার পথ দেখায় না। তাই আজ দেখিতে হইবে—কি নিগূঢ় কৌশল, কি বস্তুতন্ত্র সাধনার বলে, ঠাকুর যৌবনজলতরঙ্গে জীবনতরী ভাসাইয়া অবহেলায় পার হইয়াছেন। শঙ্কর বুদ্ধের মত ইহবিমুখ অস্বাভাবিক বৈরাগ্য জীবনজয়ের অস্ত্রস্বরূপ ঠাকুর ব্যবহার করেন নাই, সহজ পথেই জীবন-সঙ্গিনীর সহবাসে হাসিতে-হাসিতে রসে-ভাবে ভারতের যে কোনও

ত্যাগী মহাপুরুষের মত, তিনিও বৈরাগ্যের গৈরিক উড়াইয়াছেন। তাঁর জীবনসাধনা তুলনাহীন, একেবারে অভিনব উপায়ে সুসিদ্ধ হইয়াছে।

যে তন্ত্র ও সহজিয়ার কথা শুনিলে অর্ব্বাচীন যুগের অধিকাংশ শিক্ষিত শ্রেণী মুখ ফিরান, জীবের এই গুরুতর সমস্যার মীমাংসা বুঝি সেই তন্ত্র-সহজিয়ার কৌশলেই তিনি সিদ্ধ করিয়াছেন। ঠাকুরের জীবন দিয়া বাঙ্গালীর মর্ম্মতন্ত্র মূর্ত্তি লইয়াছে, বেদবিধি ছাড়া বাংলার সাধনাই সিদ্ধ হইয়াছে। তাই বাঙ্গালীকে আমরা কাশী, কাঞ্চী, মিথিলা, প্রভাস, কুরুক্ষেত্র, বৃন্দাবন প্রভৃতি ভারত-সভ্যতার নিদর্শন-স্বরূপ তীর্থক্ষেত্রের অপেক্ষা নান্নুর, কেন্দুবিল্ব, নবদ্বীপ, হালিসহর, দক্ষিণেশ্বরের রজেই গড়াগড়ি দিতে বলি। যে সাধনা জীবন লইয়া খেলা—কল্পনার স্থান যাহাতে নাই, তাহার নিগূঢ় সঙ্কেত বাঙ্গালীর জীবনবেদেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। পঞ্চবটীমূলে বেদান্তের দীক্ষা আত্মসাৎ করিয়া, ঠাকুর জীবনের দশবিধ সংস্কারের মধ্য দিয়াই অনাঘ্রাত কুসুমের মত অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্বের বিমল সৌরভ বিকীর্ণ করিয়াছেন। এমন বিশুদ্ধ, বাস্তব, সিদ্ধ জীবনের বিগ্রহ ভারতে আর কোথাও আমরা খুঁজিয়া পাই না।

প্রথম—সহজ বুদ্ধি দিয়া, সাধারণ ভাবেই আমরা তাঁর দাম্পত্য-জীবনের মর্ম্ম উপলব্ধি করার চেষ্টা করিব। ১২৬৬ সালে তিনি পঞ্চমবর্ষীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ঠাকুরের বয়স তখন ২৪ বৎসর। এই অস্বাভাবিক বয়সের ব্যতিক্রম তাঁহাকে সে যাত্রা রক্ষা করিয়াছে, এইরূপ ভাবা অসঙ্গত নহে। তারপর প্রকৃত প্রস্তাবে যখন স্বামী স্ত্রীর মিলন হইল, তখন শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর বয়স চতুর্দ্দশ মাত্র। পূজনীয় সারদানন্দ মহারাজ তাঁর "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গে" এই সময়ের কথা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন "কামারপুকুর অঞ্চলের বালিকাদের সহিত কলিকাতার বালিকাদের তুলনার অবসর যিনি লাভ করিয়াছেন,

তিনি দেখিয়াছেন যে, কলিকাতা অঞ্চলের বালিকাদের দেহের ও মনের পরিণতি স্বল্প বয়সেই উপস্থিত হয়, কিন্তু কামারপুকুর প্রভৃতি গ্রাম সকলের বালিকাদের তাহা হয় না, চতুর্দ্দশ এবং কখনও-কখনও পঞ্চদশ ও ষোড়শ বর্ষীয়া কন্যাদিগেরও সেখানে যৌবনকালের অঙ্গলক্ষণসমূহ পূর্ণভাবে উদ্গত হয় না······অতএব চতুর্দ্দশ বৎসরে প্রথমবার স্বামি-সন্দর্শন-কালে, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী বালিকা মাত্র ছিলেন" (পৃঃ ৩৬৭, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ)—ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয়, ঠাকুরের সহিত শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর দ্বিতীয়বার মিলনেও দৈবই তাঁহাকে সম্ভোগাদি প্রাকৃত জীবনের আচার হইতে রক্ষা করিয়াছে। তারপর ইহার চারি বৎসর পরে, আমরা ঠাকুরকে শ্রীমার সঙ্গে দেখি দক্ষিণেশ্বরে। তখন ঠাকুরের বয়স প্রায় ছত্রিশ, শ্রীমার বয়ঃক্রম অষ্টাদশ। নারী-পুরুষের ইহা যৌবনযুগ বলিতে হইবে। এই সময়ে ঠাকুরের যে সকল দিব্য আচরণের আভাস পাই, তাহা আর সাধারণ জীবনে সম্ভবপর বলিয়া মনে করা যায় না। সত্যই জীবন-যুদ্ধে তিনি অটুট ব্রহ্মচর্য্য-রক্ষার যে কৌশল আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহা জানিতে আকুলতা জন্মে। উচ্চ জীবনচ্ছন্দে যাহারা ছুটিতে চাহে, এই আকুলতা তাহাদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। আমরা সেই কথারই যথাসাধ্য আলোচনা করিব।

বিবাহসংস্কারের পর দীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষ পরে, ঠাকুর পূর্ণযৌবনা মহাশক্তির সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। এই দ্বাদশ বর্ষে তাঁর জীবনে অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল। ঠাকুরের সাধনরহস্যের কথা লইয়া বিস্তৃত আলোচনার ক্ষেত্র ইহা নহে, তাঁর দাম্পত্যজীবনের মধ্যে যে নিগূঢ় রহস্য তরুণ সাধককে আশা ও নৈরাশ্যের সঙ্কেত দেখাইয়া লুকোচুরি করে, সেই কথাই বুঝিবার চেষ্টা করিব।

১২৬২ সালে ঠাকুরের বিবাহ হয়। বিবাহের পর হইতেই তাঁর জীবনে

বৈধী সাধনার স্রোতঃ বহিতে থাকে। ব্রাহ্মণীর আগমনে তন্ত্রসাধনায় তিনি শাস্ত্রনির্দ্দেশমত অগ্রসর হইবার সুযোগ পান। পর-পর পঞ্চরসাত্মক সখ্য, বাৎসল্য, মধুরান্ত সাধনতত্ত্ব, বেদান্ত, ইস্‌লাম প্রভৃতি অসংখ্য মতের সাধনায় তিনি বিবাহের পর দ্বাদশ বর্ষ অতিবাহিত করেন। বিবাহের পূর্ব্বে যে সব ভাবের উপলব্ধি হইয়াছিল, সেইগুলি শাস্ত্রানুসারে তাঁর অন্তরে দৃঢ়মূল হইয়াছিল পরবর্ত্তী যুগে।

১২৬২ সালে দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির মন্দিরপ্রতিষ্ঠা হয়। ইহার অব্যবহিত পরেই ঠাকুর পূজকের আসন অধিকার করিয়া, যে অপূর্ব্ব ভাব ও সাধনায় উন্মাদ হইয়া পড়েন, তাহা সাধারণ জীবনে প্রায় লক্ষিত হয় না। তিনি যে হোমাপাখীর কথা বলিতেন, তাহা তাঁর আত্ম-জীবনেরই অভিজ্ঞতা। স্বার্থস্পর্শের আশঙ্কা মাত্র, তিনি তুরীয় ভূমিতে অধিরোহণ করিতেন। ইহা ছিল তাঁর জন্মসিদ্ধ অবস্থা। কেবল লোক-গুরু হওয়ার জন্যই তিনি চরম সিদ্ধি লাভ করিয়াও, একে-একে গুরুমুখী হইয়া পরবর্ত্তী যুগে সাধনা করেন।

১২৬৪ সালের পূর্ব্বেই ঠাকুর ঈশ্বরপ্রেমে উন্মাদ হইয়াছিলেন। প্রথমে এই উন্মাদ অবস্থা দিব্যোন্মাদ বলিয়া কেহ বিশ্বাস করে নাই; কিন্তু বহু অলৌকিক ভাবের প্রকাশ হওয়ায়, পরে ঠাকুরের প্রতি মন্দিরপ্রতিষ্ঠাত্রী রাসমণি হইতে তাঁর জামাতা মথুরবাবু ও অন্যান্য সকলেই বিশেষ শ্রদ্ধাপরায়ণ হইয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণী আসিয়া তাঁহাকে তন্ত্রসাধনায় দীক্ষিত করার পূর্ব্বে, ঠাকুর জীবন-গ্রন্থিমুক্ত হইয়াছিলেন। উন্মাদবেশে ঠাকুরকে যখন গঙ্গাতটে পড়িয়া আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করিতে দেখি, তখন তাঁর অন্তরে যে কি ভীম ঝটিকা উঠিয়াছে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। জীবনসমস্যা-মীমাংসার সকল বিঘ্ন জয় করার জন্যই তাঁর এইরূপ অবস্থা হইত।

তিনি অষ্টপাশ হইতে মুক্ত হইয়া ধ্যানে বসিতেন—ঘৃণা, লজ্জা, কুল, শীল, ভয়, মান, জাতি ও অভিমান ত্যাগ না হইলে মুক্তি হয় না, ইহা তিনি বুঝিতেন,—উপবীত ও পরিধানের বস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করিয়া, কত রাত্রি নির্জ্জনে বেলতলায় কাটাইতেন। মনে-মনে ত্যাগ —ত্যাগ নহে। দেহের সহিত ঐ সকলের সম্পর্ক-ত্যাগের জন্য তাঁর যে কি আকুলতা প্রকাশ হইত, তাহা দেখিয়াই অনেকে তাঁহাকে উন্মাদ ভাবিত। জাতিমর্য্যাদা ও অভিমানত্যাগের জন্য, তিনি মেথরের সেবায় নিযুক্ত হইতেন। বাসনাবর্জ্জনের জন্য কামকাঞ্চন লইয়া তাঁর চুলচেরা বিচার সাধনজগতে নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করিয়াছে।

পরিশেষে—তাঁর মাতৃদর্শন ঘটিল। সাধনার সামান্য আভাষ যাঁহাদের জানা আছে, তাঁহারা অনায়াসেই বুঝিবেন—এই দর্শন কোন্ অবস্থার লক্ষণ। একে-একে মূলাধার হইতে দ্বিদল আজ্ঞাচক্র উদ্ভিন্ন না হইলে—ঈশ্বরদর্শন কল্পনামাত্র। ঠাকুরের প্রত্যক্ষ ঈশ্বরদর্শন হইয়াছিল, ইহা অস্বীকার করার উপায় নাই। অতএব ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, বিবাহের পূর্ব্বে ঠাকুরের আত্মদর্শন হইয়াছিল। তাই দিব্যদৃষ্টি লইয়াই তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন, ইহা আকস্মিক ঘটনা অথবা উন্মাদের খেয়াল নহে। ঠাকুর বিবাহের পূর্ব্বে যে প্রাকৃদৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ তিনি দিয়াছিলেন। পাত্রী অন্বেষণে সকলে হয়রান হইলে, ভাবাবেশে তিনিই পাত্রীর সন্ধান প্রদান করেন।

এই রহস্যের মূলে ভবিষ্য ভারতের নূতন শিক্ষা ও সাধনার সঙ্কেত আছে। ঠাকুর জগজ্জননীকে প্রত্যক্ষ করিয়া জানিয়াছিলেন, তাঁহাকে কি করিতে হইবে। তাঁহার বিবাহ—নবযুগ-স্থাপনের প্রথম পদক্ষেপ।

জীবনের চৈতন্য-শক্তি রুদ্ধ হইয়া নাড়ীচক্রের বাহিরে, রক্তমাংসের আসক্তিতেই মজিয়া থাকে। ইহা পশুভাব। এই চেতনাকে সংহৃত করিয়া আত্মস্থ করিতে হয়, কেন্দ্রীকৃত করিতে হয়; তবে যোগশক্তিরূপে রুদ্ধ চক্রদ্বার উন্মোচন করিয়া দিব্য জীবনের সন্ধান মিলে। অষ্টপাশ ছিন্ন করিব বলিলেই করা যায় না, সহজে বাসনা ও অহঙ্কারের গ্রন্থি-মোচন হয় না। মূলাধার হইতে চক্রের পর চক্র চেতনার জাগরণে যখন প্রস্ফুটিত পদ্মের মত বিকশিত হয়, তখন অসৎ যাহা, তাহা নূতন আলোকে সৎ-এর বরণ ধারণ করে, হয় রূপান্তর। আঁধারে যাহা অস্পষ্ট ও ভয়ের কারণ, আলোকস্পর্শে তাহা আশা ও উৎসাহের মূর্ত্তি লইয়া ফুটিয়া উঠে। চেতনাস্পর্শে প্রত্যেক গ্রন্থি যখন উন্মোচিত হয়, তখন সেখানে সৎ-এর প্রতিষ্ঠা হয়। তন্ত্রে এই নাড়ীচক্রে শিবময় মূর্ত্তির বিদ্যমানতার কথা লিখিত আছে। অধিরোহণের কালে এই শিবময় চিহ্ন স্থাপন করিয়াই উঠিতে হয়, কেন-না অবতরণকালে ইহাই পথের সঙ্কেতরূপে সাহায্য করে।

ঠাকুরের এই সব সাধনা মায়ের কৃপায় সুসিদ্ধ হইয়াছিল। ঈশ্বরদর্শনের তীব্র আগ্রহই আপনা হইতেই তাঁহাকে সুপথে চালিত করিয়াছিল। ঠাকুরের গুরুমুখী সাধনা তাঁর স্বতঃসিদ্ধ জীবনের ব্যাখ্যা ভিন্ন অন্য কিছু নহে। তিনি ছিলেন স্বয়ং-সিদ্ধ—শ্রীভগবানের বিগ্রহমূর্ত্তি।

পদ্মকোরকে মকরন্দ সঞ্চিত হইলে মক্ষিকা যেমন ঝাঁকে-ঝাঁকে সেইদিকে ধাবিত হয়, তদ্রূপ চেতনা যখন লক্ষ্যে গিয়া স্থির হয়, তখন বস্তুরূপে নিম্নমুখী অসংখ্য প্রবৃত্তিকে উপরেই আকর্ষণ করে। পিপীলিকা-শ্রেণীর মত, প্রতি ধমনী বহিয়া জীবনের সকল বৃত্তি তখন উপরের দিকেই ছুটিতে থাকে। সহজিয়া সাধনায় এই অবস্থার কথা ব্যক্ত করিতে গিয়া, উক্ত হইয়াছে—

"প্রবর্ত্ত সাধিতে বস্তু অনায়াসে উঠে।
নামাইতে বস্তু- -সাধক বিষম সঙ্কটে ॥"

ঠাকুর আসিয়াছিলেন—জীবনসমস্যার অন্তরায়গুলির আমূল উচ্ছেদ করিতে, পার্থসারথির স্বপ্ন ধর্ম্মরাজ্য-স্থাপনের সিদ্ধবেদী গড়িতে। তাই তিনি সঙ্কটকেই বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। ঠাকুরের বিবাহ—এই গভীর তত্ত্বজড়িত অপরূপ রহস্য!

রতি স্থির হইলে, তাহা আর নামিতে চাহে না। ভারতের সাধনায় ইহাই তো ঘোরতর সমস্যা। এই রতির অবতরণেই তো প্রেমের সৃষ্টি সম্ভবপর। উঠিবার কালে গ্রন্থিতে-গ্রন্থিতে যদি শিবত্বের প্রতিষ্ঠা না হয়, অবতরণকালে তবে তির্য্যক্ পতনের সম্ভাবনা। এইরূপ পতনই অতীতের অধিকাংশ মহাপুরুষগণের জীবনে দেখা যায়। ঠাকুর সতর্ক চরণে ঋজু মধ্যপথ ধরিয়া নামিতে চাহিয়াছেন, তাই তাঁর ধর্ম্মনীতি সামঞ্জস্যপূর্ণ। পরে এই সকল কথারই আলোচনা করিব।

* *
*

॥ ২ ॥

যাঁহারা জন্মসিদ্ধ, তাঁহাদের সাধনা শরীর ও মনের ময়লা দূর করার জন্য। ভাগবত পুরুষেরাও প্রাকৃতসংস্কারবিযুক্ত হইতে পারেন না; তাই ঠাকুরের স্বতঃসিদ্ধ ঈশ্বরপ্রেরণা উদ্বুদ্ধ হওয়া মাত্র, তিনি শরীর ও মনের শোধন আরম্ভ করেন। ঈশ্বরজ্ঞান নিত্য স্থায়ী রাখার পথে শরীর-মনের সংস্কার যে প্রবল বাধা, ইহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। সাধনার প্রথম যুগে তাঁর এই বিষয়ে সতর্কতা ভবিষ্যযুগের মানুষ যাঁরা, তাঁদের সম্মুখে শুদ্ধিযজ্ঞের একটা নূতন আদর্শ স্থাপন করিয়াছে।

ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ ঠাকুরের নিত্য স্বভাব বলিয়া, ইহার উদয় সহজ ভাবেই হইয়াছিল; কিন্তু প্রেমের বিগ্রহমূর্ত্তি হওয়ার জন্য, তাঁহাকে বাধার সহিত মনে-মনে সংগ্রাম করিয়াই নিশ্চিন্ত হইতে দেয় নাই, শরীরকে তদনুযায়ী গড়িয়া তুলিতে তিনি প্রাণপণ করিয়াছিলেন। এই সময়ের আচরণ সাধারণ মানুষের পক্ষে নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য ছিল; তাই তিনি নিতান্ত আত্মীয়দের নিকট হইতেও বাধা পাইতেন, তাঁহাকে উন্মাদ জ্ঞানে অনেকেই উপেক্ষা করিত।

ভিতরের সংগ্রাম—শরীর ও মনকে লইয়া। কল্পনির্দ্দিষ্ট যাহা, তাহা জীবনে যথাযথ ফলাইয়া তোলাই তো সাধনা। তাই তিনি সর্ব্ববিধ বিরোধী তত্ত্বগুলিকে মনে-মনে ত্যাগ করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না, শরীরকে পর্য্যন্ত বৈরাগ্যের আগুনে দগ্ধ করিতেন। মনের ত্যাগ তিনি ত্যাগ বলিয়াই গ্রাহ্য করিতেন না, যতক্ষণ-না উহা শরীর ও ইন্দ্রিয়বৃত্তি দিয়া গ্রাহ্য হইত। ভাবের ঘরে চুরি ছিল তাঁর অসহ্য। দেহ-মনের

জন্মার্জ্জিত সংস্কার অপরিত্যজ্য, অথচ উহা হইতে নিষ্কৃতি না পাইলে সিদ্ধজীবন অসম্ভব। এই হেতু এই যুগে নূতন ও পুরাতন সংস্কারের দ্বন্দ্ব তাঁর জীবনে ঘোরতর বিপ্লব বাধাইয়া দিত, তাঁর অমানুষিক অস্থিরতা ইহারই অকপট অভিব্যক্তিরূপে প্রকাশ পাইত। এই নূতন শক্তিকে দেহে-মনে স্থিরপ্রতিষ্ঠ করিবার জন্য, তাঁহার আহারত্যাগ হইয়াছিল, চক্ষে নিদ্রা ছিল না, ধমনীতে রক্তস্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইত, ব্যথায় অস্থির হইয়া মাঝে-মাঝে তিনি এমন আর্ত্তনাদ করিতেন যে, চতুর্দ্দিক্ হইতে লোক আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিত; কিন্তু কি ঘোরতর জীবনসমস্যার মীমাংসায় যে তিনি বিব্রত, তাহা বুঝিবার মত শক্তি কাহারও ছিল না। কাজেই তাঁহাকে এই সময়ে পাগল বলিয়া সকলের যে ধারণা হইবে, তাহা কিছু অস্বাভাবিক কথা নহে।

দেহ-মনের এইরূপ অনিবার্য্য সংস্কার ও অশুদ্ধতাবশতঃ, তাঁর সিদ্ধদর্শন যে অপ্রকটিত ছিল, তাহা নহে। সাধারণ মানুষের পক্ষে যাহা, ঠাকুরের পক্ষে তাহার সব কিছুই বিপরীত ছিল। তিনি যে জন্ম-সিদ্ধ! অবতরণের মধ্যে যে মলিনতা দেহ-মনকে আশ্রয় করে, তাহা হইতে মুক্তির চেতনাই তাঁহাকে পাগল করিত। তিনি নিজেই এই সময়ের কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেন—"অসহ্য যন্ত্রণায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইলেই, দেখিতাম মার বরাভয়করা চিন্ময়ী জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি!" অন্তর ও বাহির, উভয়ের মধ্যে জীবের যে স্বভাবভেদ, তাহা ভাঙ্গিবার উপক্রম নানারূপ লক্ষণ প্রকাশ করিত। সাধনা করিয়া ঠাকুর আত্মদর্শন করেন নাই, আপনাকে মর্ত্ত্যজীবনে সম্যক্ প্রকাশের সংগ্রামই সাধনা-রূপে ফুটিয়া উঠিত। ঠাকুরকে কোন যুগে সাধক বলা যায় না, তিনি ছিলেন শুদ্ধসত্ত্ব, বিগ্রহবান্ সাক্ষাৎ ভগবন্মূর্ত্তি!

চেষ্টা বা বাসনা-রূপে যেখানে ভাগবত সাধনার উদয় হয়, সেখানে

সমুচ্চের গতি ঋজু পথে সাধিত হয় না, অবধারিত তির্য্যক্ পথ আশ্রয় করে। ঠাকুরের জীবনে ঈশ্বরীয় ভাব কেমন সহজ ভাবে অবতরণ করিয়াছিল, তাহা তিনি নিজ মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন। "বন্যা যখন অতর্কিত ভাবে মানবজীবনে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন তাহাকে চাপিবার ঢাকিবার সহস্র চেষ্টা করিলেও পারা যায় না। শুধু তাহাই নহে, অনেক সময়ে স্থূল জড় দেহ ও মন সেই প্রবল বেগ ধারণ করিতে সমর্থ না হইয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যায়। ঐরূপে অনেক সাধক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। পূর্ণজ্ঞান বা পূর্ণভক্তির উদ্দাম বেগ ধারণ করিবার জন্য উপযোগী শরীরের প্রয়োজন। অবতার-প্রথিত মহাপুরুষদিগের শরীর সকলেই কেবলমাত্র উহাদের পূর্ণবেগ সর্ব্বক্ষণ ধারণ করিয়া সংসারে জীবিত থাকিতে এ পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে।" (১৩১ পৃঃ, সাধকভাব, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ)

ইহার উপর আর কোন টীপ্পনী নাই। বন্যার মতই কল্পপ্রেরণা তাঁর জড় দেহ-মনে স্বভাবতঃ অবতরণ করিয়া জীবন তোলপাড় করিয়া দিয়াছিল। তাঁহার সাধকভাব—ঈশ্বরপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাবশতঃ নয়, ঈশ্বরপ্রাপ্তির প্রকাশ হেতু, ইহা বলাই বাহুল্য।

এই সহজ প্রেরণার সন্ধান না- পাইয়া, বাসনাবিমূঢ় জীব যখন চেষ্টা করিয়া ঈশ্বরসাধনায় উদ্যত হয়, তখন উৎকট দৃঢ়তার প্রভাবে, প্রবৃত্তির নিম্নমুখী প্রবাহ উপর দিকে যে না উঠে, এরূপ নহে। রাগাত্মিকা সাধনায় যে পথ মুক্ত হয়, বৈধী আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মে সে পথ রুদ্ধ থাকে। তাই আয়াসসাধ্য তপস্যার প্রভাবে জীবের চেতনা হয় ঈড়া, না হয় পিঙ্গলার দ্বার দিয়া ঊর্দ্ধমুখী হয়। সাধনার জগতে ইহা বিচিত্র গতি, অস্বাভাবিক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহাই বামাচার ও দক্ষিণাচার উভয় মার্গ। সাধারণতঃ, সাধন বলিতে এই দুই পথই আমাদের

দৃষ্টিপথে পতিত। ইহা ব্যতীত তৃতীয় পন্থা সকলের ভাগ্যে আবিষ্কৃত হয় না। ঠাকুর এই তৃতীয় পন্থার সন্ধান জানিতেন, তিনি বৈধী নৈষ্ঠিক আচারগ্রহণের পূর্ব্বেই এই ঋজু ঊর্দ্ধগতি ধরিয়া ষট্চক্র ভেদ করিয়াছিলেন, আত্মস্বরূপে নিজের সবখানিকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যই দশবিধ সংস্কার ও প্রচলিত সকল প্রকার সাধনার পর্য্যায় অবহেলায় পার হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনে ইহাই উত্তম রহস্য।

ঠাকুর স্বরূপলাভের জন্য প্রকৃত প্রস্তাবে কোন শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন করেন নাই; যাহা কিছু করিয়াছেন সিদ্ধ জীবনে, তাহা কেবল লোকশিক্ষার জন্যই। দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া, কেনারাম ভট্টের নিকট তাঁহার যে দীক্ষা, উহা লোকতঃ মন্দিরাধিষ্ঠাত্রী দেবতার পূজার অধিকারার্জ্জনের জন্য। "শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা না লইয়া দেবীপূজা প্রশস্ত নহে জানিয়া, শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইবার সঙ্কল্প স্থির করিলেন", (১০৫ পৃঃ, সাধকভাব, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ) এবং দীক্ষা গ্রহণ মাত্র, ঠাকুর ভাবাবেশে সমাধিস্থ হন, কেনারাম ভট্ট ইহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। ইহাতে কি স্পষ্টই প্রমাণ হয় না যে, ঠাকুর সাধনার দ্বারা সিদ্ধ নহেন, ঠাকুর জন্মসিদ্ধ. সাধনা তাঁহার লোকশিক্ষার কৌশল মাত্র!

জগদম্বার মূর্ত্ত প্রতিমার পূজার ছলে, তিনি আপনার সিদ্ধ দর্শনের নানা নিদর্শন ব্যক্ত করিয়াছিলেন। কোথায় এমন কাহাকে দেখা গিয়াছে, যিনি ধ্যানে বসিলেই কঠিন পাষাণপ্রতিমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে জীবন্ত ভাব দেখিয়া ধন্য হইয়াছেন, কাহার কর্ণে ইষ্টমূর্ত্তি কণ্ঠধ্বনি তুলিয়া জীবনের নির্দ্দেশ দিয়াছেন? ঠাকুর অন্ন নিবেদন করিবামাত্র দেখিতেন—জননীমূর্ত্তির নয়ন হইতে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ নিঃসৃত হইয়া নিবেদিত অন্নের সার সংগ্রহ করিয়া আবার নয়নে সংহৃত হইতেছে।

এই সকল অপূর্ব্ব দর্শন চেতনার কোন স্তরে পৌঁছিলে সম্ভবপর হয়, তাহা বোধহয় না বলিলেও চলিবে।

অধিরোহণ চরম স্থানে গিয়া পৌঁছিলে, সত্য সংকল্পের জাগরণ হয়। এই অবস্থায় সাধক সার্ষ্টি, সারূপ্য প্রভৃতি মুক্তির অধিকারী হয়। ঠাকুর মুক্তি-মোক্ষের প্রত্যাশী ছিলেন না।" শ্রীশ্রীজগন্মাতা তাঁহাকে জগতের কল্যাণের জন্য শরীর পরিগ্রহ করাইয়াছিলেন" (১৪৫ পৃঃ, সাধকভাব, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ) অথবা "তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।"

ঈশ্বরাবতার জন্মসিদ্ধ হলেও, সে সিদ্ধির প্রকাশ কালের অপেক্ষা রাখে। ঠাকুরের জীবনে ইহার প্রকট প্রমাণ দেখা যায়। জগৎ সিদ্ধ নহে বলিয়াই অবতরণলক্ষণ প্রতীত হয়। এক বস্তু হইতে অন্য বস্তু পৃথক্ হইলেই, ভেদ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রাকৃত ক্ষেত্রে অপ্রাকৃত সৃষ্টি অসাধারণ বলিয়া বোধ হওয়া অসঙ্গত নহে। মর্ত্ত্য যদি স্বর্গ হইত, স্বর্গীয় গুণাবলী ইহার সভাবরূপেই পরিগণিত হইত। অসংখ্য মিথ্যার মাঝে সত্যের অগ্নিকণা তাই এত সহজে চক্ষে পড়ে। ঠাকুর এই অশুদ্ধ স্থূল শরীর লইয়াই অবতরণ করিয়াছিলেন। স্থূলে ভাগবত চেতনা জাগ্রৎ করার তপস্যা—জীবনের গোড়া হইতে শেষ দিন পর্য্যন্ত দেখা যায়। এই নিগূঢ় তত্ত্বের ব্যাখ্যা ঠাকুরের নিজের মুখেও যেমন প্রকাশ পাইয়াছে, তাঁর অভেদ অংশ-স্বরূপ যাঁহারা, তাঁহারাও তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। এই জীবনবেদের নবঋক্ শুনিবার কাণ হারাইয়া আমরা আজ সত্যভ্রষ্ট।

ভারতের সন্ন্যাসসংস্কারের নিগূঢ় রহস্যদ্বার ঠাকুর উদ্ঘাটন করিয়া জীবনের সত্য আবিষ্কারের পথ নির্ণয় করিয়াছেন, সে কথা পরে বলিতেছি।

এই দেহজ্ঞান থাকিতে দিব্য জ্ঞান স্থায়ী নয়, ইহা ঠাকুরের

জীবনে বার-বার দেখা গিয়াছে। ইহার হেতু—এ জ্ঞানে সে জ্ঞানে যুক্তির অভাব ভিন্ন অন্য কিছু নহে। দেহচেতনার স্তরে ভাগবত চেতনা বিদ্যুৎস্পর্শের মত ক্ষণিক হইলেই যে দিব্য দেহ হইবে এমন কোন কথা নাই, স্পর্শেই অমৃতের অনুভূতি—নিত্য স্পর্শ না হইলে, ইহা খণ্ড, নিরবচ্ছিন্ন নহে। অনন্তের মাঝে ফাঁক—মৃত্যুরই আশ্রয়। ঠাকুরের অন্তর্দ্ধানও অপূর্ব্ব রহস্যময়।

ভগবান্ নিত্য অপাপবিদ্ধ। ঠাকুরের পাপপুরুষ দগ্ধ হওয়ায় দারুণ গাত্রদাহ উপস্থিত হইয়াছিল। এই সকল অনুভূতির কথা শাস্ত্রেই পড়া যায়, প্রত্যক্ষানুভূতির এমন জ্বলন্ত চিত্র আর কোথাও মিলিবে না। পাপ—বিরহের রূপ। ভাগবত মিলনে—রসের সৃষ্টি। যেখানে প্রেমের আলো পৌঁছায় না, সেইখানেই তো অন্ধকার পুঞ্জীভূত থাকে। অবতরণের হেতু—উপরের আলো নীচে নামাইয়া আনা। একবার বিড়ালের ভাগ্যে শিকা ছিঁড়িলে হইবে না, ইহাকে নিত্য স্থায়ী করিতে হইবে। ঠাকুর উপরের আস্বাদ সুষুম্নার দ্বার দিয়া লাভ করিয়াছিলেন, স্বরূপপ্রকাশের সিদ্ধান্তও নির্ণয় করিয়াছিলেন। মুক্তি-মোক্ষের আকাঙ্ক্ষা তাঁর ছিল না। তিনি উপর হইতে হৃদয়ে অবতরণ করিয়াই, সৃষ্টির আদিতত্ত্ব কামবীজের সন্ধান পাইলেন। দশবিধ সংস্কারক্ষয় করার জন্য তিনি জগন্মাতার বিগ্রহমূর্ত্তি বরণ করেন নাই, সাধন-সংস্কারক্ষয়েব জন্য ব্রাহ্মণীর আশ্রয় কেমন নির্ম্মমভাবে বিসর্জ্জন দিয়াছেন, উহা অনায়াসেই বুঝা যায়। সাধনার উপকরণ হিসাবে যাহা গ্রহণ, তাহার বর্জ্জন আছে; সিদ্ধ রূপের প্রকাশ—জীবনের সহিত নিত্য সম্বন্ধ। ঠাকুরের প্রথম অবতরণেই, সম্বন্ধতত্ত্বের প্রকাশস্বরূপ শ্রীশ্রীমার আবির্ভাব। ভগবানের ইহাই তো বিশ্রামক্ষেত্র—ভাগবত হৃদয়ের অটুট প্রতিষ্ঠা।

কিন্তু ইহার পরেই, ঠাকুরকে আমরা আরও অধিক নিবিড় ভাবে সাধননিরত দেখি—এক-আধ বছর নয়, দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর এবং এই দ্বাদশ বর্ষের শেষে, শ্রীশ্রীমাতার ষোড়শী মূর্ত্তির শুভ দর্শন পাইয়া আমরা ধন্য হই। এই বিচিত্র রহস্যের মূল কথা যে একেবারেই অপ্রকাশ আছে তাহা নহে ; পূজনীয় সারদানন্দ স্বামী স্পষ্ট করিয়াই ব্যক্ত করিয়াছেন :—"শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু, শ্রীশঙ্কর, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি রূপে পূর্ব্ব-পূর্ব্ব যুগে যে লীলা লোকগুরুদিগের জগৎকে দেখাইবার প্রয়োজন হয় নাই, তাহাই এ যুগে তোমার-আমার প্রয়োজনের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণশরীরে প্রদর্শিত হইয়াছে। জীবনব্যাপী কঠোর তপস্যা ও সাধনবলে উদ্বাহবন্ধনের অদৃষ্টপূর্ব্ব পবিত্র **"ছাঁচ"** জগতে এই প্রথম প্রস্তুত হইয়াছে।" (পৃঃ ১৪২, গুরুভাব পূর্ব্বার্দ্ধ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ)

ঈশ্বরলাভে উন্মত্ত বর্ত্তমান যুগের তরুণ ঠাকুরের এই পবিত্র ছাঁচের পশ্চাৎ কি আধ্যাত্মিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে এবং তাহা সাধনার কি পরম লক্ষণ, তাহা আজিও মর্ম্ম দিয়া অবগত হইতে পারে নাই— "কামকাঞ্চন" ত্যাগের দেবতা ঠাকুরের প্রকট জীবনের প্রখর জ্যোতির্জ্জাল বিদীর্ণ করিয়া নিগূঢ় তত্ত্বের সন্ধান পায় নাই। তাই জীবনের সমস্যার তো নিরাকরণ হইল না ! আমরা ইহারই মর্ম্মকথা ব্যক্ত করিব।

॥ ৩ ॥

জীবের সহিত জগদীশ্বরের যদি যোগ সাধিত হইত, তাহা হইলে মর্ত্ত্য স্বর্গে পরিণত হইত। এই যোগের জন্যই ভারতের অবতার মহা-পুরুষগণ যুগে-যুগে আত্মদান করিয়াছেন। তাঁহাদের করুণ আত্মদান-কাহিনী হৃদয় নিঙড়াইয়া অশ্রু উথলিয়া তুলে, শরীর রোমাঞ্চিত করে; কিন্তু এই শিহরণের তৃপ্তি তো সান্ত্বনার হেতু নহে! জীবনের সহিত ভগবানের যোগ—সে সিদ্ধপথ কে আবিষ্কার করিবে? সে পরম রসের সন্ধান কে দিবে? সে শুভদিনের কত বাকী? কে জানে—এ প্রশ্নের সদুত্তর কোন দিন মিলিবে কি না!

"যে আনন্দের দিক্ নাই, দেশ নাই, আলম্বন নাই, রূপ নাই, নাম নাই! কেবল অশরীরী আত্মা আপনার অনির্ব্বচনীয় আনন্দময় অবস্থায় মন-বুদ্ধির গোচরে অবস্থিত যত প্রকার ভাবরাশি আছে, সে সকলের অতীত এক প্রকার ভাবাতীত ভাবে অবস্থিত! ······যাহাকে শাস্ত্রে "আত্মায়-আত্মায় রমণ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।" (পৃঃ ৪৯, গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ) কিন্তু এই আনন্দ যখন জীবনের উপর ভিত্তি করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবার নহে, তখন ইহার কি প্রয়োজন—জীবন চাহে যাহারা তাহাদের? পৃথিবী তো লয়ের জন্য, অস্তিত্বলোপের জন্য সৃষ্ট হয় নাই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দকে হৃদয়ে ধরিয়া সার্থক হইতেই যে তাহার জন্ম! আর এই জন্যই তো যুগে-যুগে প্রেমিকের আত্মদান! সরযূর পূত সলিলে শ্রীরামচন্দ্রের আত্মবিসর্জ্জন, উহা কি "আত্মায়-আত্মায় রমণ"-

সাধনের আদর্শ প্রমাণের জন্য? শ্রীকৃষ্ণের বিষজর্জ্জরিত কাতর দেহ-খানি ভূপৃষ্ঠে আছাড় খাইয়া যেদিন প্রাণত্যাগ করিল, উহা কি এই তুরীয় আনন্দের প্রতিষ্ঠা হেতু? না খৃষ্টের আত্মবলি জীবনের অতীত সম্পদাহরণের পথ? যেদিন নবদ্বীপচন্দ্র দেখিলেন—তাঁর অভিন্নহৃদয় সহকর্ম্মী শ্রীনিত্যানন্দ জীবের কল্যাণ হেতু মহামায়ার ছলনায় সংসারে নামিয়া পড়িলেন, সেদিন যে বিরহের আগুন বুকে তাঁর জ্বলিয়া উঠিল, সে কিসের জ্বালা?

মর্ত্ত্যের সহিত স্বর্গের সেতু গড়ার সঙ্কল্প লইয়াই অবতার-মহাপুরুষগণ অবতরণ করেন, ঠাকুরের জীবনে সে সঙ্কেত প্রকৃষ্টরূপে ফুটিয়াছে। তিনি এই তুরীয় আনন্দপ্রাপ্তির কথা ভক্তদের নিকট ব্যক্ত করার যখন চেষ্টা করিতেন, আর বলিতে গিয়াই কণ্ঠ পর্য্যন্ত চক্রাদিভেদ-রহস্য বলিয়াই যখন সমাধিস্থ হইতেন, তখন সকলেই বুঝিতেন তিনি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের সন্ধান পাইয়াছেন; কিন্তু সে আনন্দে স্থির হইয়া থাকার তাঁর উপায় ছিল না। তিনি নিজেই বলিতেন—জীবকোটীরা যদি একবার ইহার সন্ধান পায়, আর তাহা হইতে নামিতে চাহে না। ঠাকুর বেদান্তের সপ্তভূমিতে আরোহণ করিয়াছিলেন, ইহার বর্ণনা দিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন "সহস্রারে পরমাত্মার সঙ্গে একেবারে মেশামেশি হ'য়ে যাওয়াই সপ্তম ভূমিতে উঠা"—বেদান্তের এই চরম আদর্শে উঠিয়াও তিনি নামিতে চাহিয়াছিলেন, এই অবতরণ অবতার-পুরুষেরই লক্ষণ।

ঠাকুর বিবাহ করিয়াছিলেন—সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বে। এই সন্ন্যাস তিনি গোপনে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঠাকুরের সত্যনিষ্ঠায় সংশয় করিবার কিছুই নাই। সন্ন্যাসগ্রহণ গোপন করার উদ্দেশ্য—শোকসন্তপ্ত জননীর প্রাণে আঘাত না লাগে, এই জন্যই—এই কথাটুকু বলিয়া রাখা

প্রয়োজন ; কেন-না, সন্ন্যাসগ্রহণের পর আমরা কাহাকেও স্ত্রী-সংসর্গে অবস্থান করিতে দেখি নাই, ঠাকুরের জীবনে ইহাও এক বিচিত্র ঘটনা !

অনেকেই ভাবিবেন—ঠাকুরের বিবাহ যখন শরীর-সম্বন্ধের জন্য নহে এবং তিনি স্বীয় পত্নীতে ইষ্টমূর্ত্তি আরোপ করিয়া যখন পূজা করিয়াছেন, তখন এরূপ স্ত্রী-সংসর্গে থাকা দোষের কথা নহে। কিন্তু ঠাকুরের আজ যে পরিণত মূর্ত্তি আমরা দেখি, তাহা সাধনার ক্রম ধরিয়াই অভিব্যক্ত। ঈশ্বরের বিধান কিরূপ হইবে—ঠাকুরের অন্তর্য্যামী তাহা অবধারিত জানিলেও, লোকশিক্ষার্থে তাঁর প্রতিদিনের জীবনবিকাশের পর্য্যায়ে উহা ধরা পড়ে নাই ; মাতাঠাকুরাণীর সংসর্গে তাঁর অপূর্ব্ব বিচিত্র ভাব তরঙ্গের পর তরঙ্গে নানা মূর্ত্তি লইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। সন্ন্যাসগ্রহণের পর স্ত্রীর সহিত একত্র অবস্থানের প্রসঙ্গে তখন যে কথা না উঠিয়াছিল তাহা নহে ; কেন-না, এইরূপ বাদানুবাদের উত্তর-চ্ছলেই তোতাপুরীর মুখে আমরা এই কথাগুলি শুনিতে পাই—"তাহাতে আসে-যায় কি ? স্ত্রী নিকটে থাকিলেও যাহার ত্যাগ, বৈরাগ্য, বিজ্ঞান সর্ব্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ থাকে, সে ব্যক্তিই ব্রহ্মে যথার্থ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ; স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কেই যিনি সমভাবে আত্মা বলিয়া সর্ব্বক্ষণ দৃষ্টি ও তদনুরূপ ব্যবহার করিতে পারেন, তাঁহারই যথার্থ ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ হইয়াছে, স্ত্রী-পুরুষে ভেদদৃষ্টিসম্পন্ন অপর সকলে সাধক হইলেও, ব্রহ্মবিজ্ঞান হইতে এখনও বহুদূরে রহিয়াছে।" (পৃঃ ৩৩৫, সাধকভাব, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ)

গুরুর বিশ্বাস—শিষ্যের বীর্য্য। তোতাপুরীর এই উক্তি ঠাকুরকে পত্নী-সংসর্গে থাকিয়া আত্মজ্ঞানপরীক্ষায় সমধিক উৎসাহ দিয়াছিল। তিনি বিবাহের পর দ্বিতীয়বার জন্মভূমিসন্দর্শনে আসিয়া, প্রায় সাত

মাস কাল কামারপুকুরে অবস্থিতি করেন। এই সময়ে তিনি মাতাঠাকুরাণীর সহিত একত্র থাকিয়া তাঁহাকে এমন কিছুর আস্বাদ দিয়াছিলেন, যাহা নারীজীবনে অপার্থিব সম্পদ্। দেহসম্ভোগ ব্যতীত পতিপত্নীর সম্বন্ধের মধ্যে যে অনির্ব্বচনীয় তত্ত্ব আছে, যাহা তুরীয় বস্তু নহে, হৃদয় দিয়া অনুভূতির বিষয়, শ্রীমা তাহা উপলব্ধিগম্য করিয়াছিলেন। তাঁর নিজের কথায় ইহা ব্যক্ত হইয়াছে—"হৃদয়-মধ্যে একটী পূর্ণ ঘট যেন স্থাপিত রহিয়াছে, ঐকাল হইতে সর্ব্বদা এইরূপ অনুভব করিতাম, অনির্ব্বচনীয় আনন্দে অন্তর তখন নিরন্তর এমন পূর্ণ থাকিত।" (পৃঃ ৩৬৮, সাধক-ভাব, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ)

দাম্পত্যজীবনের বিকাশে প্রত্যেক নারীই এইরূপ একটা নবানুভূতির স্পর্শে মাতোয়ারা হয় ; যৌবনবিকাশে স্বামীর স্নেহ ও ভালবাসার স্পর্শ নারীকে কেমন নূতন করিয়া গড়ে, সংসারে যাঁহারা একটু অন্তর্দৃষ্টি রাখিয়া চলেন, তাঁহারাই প্রত্যক্ষ করিবেন। বালিকা-অবস্থার সরল চাঞ্চল্য অর্থযুক্ত হইয়া এমন চাতুরীপূর্ণ বিচিত্র ভঙ্গী চলনে, কথায়, আচরণে প্রকাশ পায়, যাহা নিতান্ত আপনার জন পিতামাতার দৃষ্টিও এড়ায় না। এ পরিবর্ত্তন স্বাভাবিক। ঠাকুরের সহিত চতুর্দ্দশবর্ষীয়া মাতাঠাকুরাণীর এই প্রথম আলাপের পর, তাঁরও চরিত্রের অসাধারণ পরিবর্ত্তন দেখা গিয়াছিল।

এই পরিবর্ত্তনের হেতু ঠাকুরের নিঃস্বার্থ স্পর্শ ভিন্ন অন্য কিছু নহে। এই সময়ে তিনি তদীয় পত্নীর প্রতি যে প্রেম, যে আদর ও আচরণ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, তাহা মাতাঠাকুরাণীর পক্ষে নিতান্ত অভাবনীয় ব্যাপার, সন্দেহ নাই। জীবনের যৌবনযুগে পুরুষের সংসর্গে যে নবীনতার আস্বাদ মিলে, ঠাকুরের সংসর্গে এই সময়ে ইনি তাহার আভাস পাইয়াছিলেন। যদিও সে আস্বাদে প্রাকৃত সম্ভোগের কোন

চিহ্ন ছিল না। কিন্তু নারী ও পুরুষের মধ্যে এই দেহগত সম্বন্ধ একান্তই গৌণ, মুখ্য বস্তু যে প্রেম, ঠাকুর তাহার বীজ বপন করিয়াছিলেন—নারীজীবনে এই সৌভাগ্য অল্প ক্ষেত্রেই দেখা যায়। প্রথম মিলনের উল্লাস তাঁর জীবনের অসাধারণ পরিবর্ত্তন আনিয়াছিল—তিনি পুনর্মিলনের স্বপ্ন দেখিয়াই দীর্ঘ চারিটি বৎসর পিত্রালয়ে কাটাইয়াছিলেন, এই তন্ময়তার মধ্য দিয়া ঠাকুরের জীবন তাঁর নিকট আপনার বস্তু হইয়া উঠিয়াছিল। প্রথম দর্শনেই হৃদয়ে যে সুবর্ণ-ঘটের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, ইহার পূর্ণাভিষেকের জন্য তিনি বিরহবিধুর কাতর জীবন যাপন করিতেন। প্রতিমুহূর্ত্তে আশা করিতেন—ঠাকুর তাঁহাকে ডাকিয়া লইবেন ; কিন্তু আশারও একটা সীমা আছে, ধৈর্য্যের বাঁধও প্রেমের আকর্ষণে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হয়, মাতাঠাকুরাণীর অবস্থাও এইরূপ হইয়াছিল। গ্রামের লোকেরা ঠাকুরের চরিত্র লইয়া নানা কথা উত্থাপন করিত, পাগলের স্ত্রী বলিয়া অনেকে তাঁহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিত ; কিন্তু স্বামীর যে মূর্ত্তি, যে আচরণ তিনি দেখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে দেবতা ভিন্ন যে অন্য কিছু মনে হয় না। তবে লোকের কথা সত্য হইলে, তাঁর অবস্থা অন্যরূপও তো হইতে পারে, এই অবস্থায় তাঁর দূরে থাকা যুক্তিযুক্ত নহে—চির-পবিত্রা সরলা বালিকা এইরূপে অস্থির হইয়াই স্বামিসন্দর্শনে ঘরের বাহির হইয়াছিলেন। এই অনাবিল প্রেমের ছবিখানি যে কত পবিত্র, কত সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যে মণ্ডিত, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে বাধে। একদিকে লেখনীর অক্ষমতা, অন্যদিকে ত্যাগবৈরাগ্যের গাঢ় বর্ণে ঠাকুরের মূর্ত্তি যেভাবে আঁকিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে এই নবানুরাগের চিত্র আঁকিতে সঙ্কোচ উপস্থিত হয়।

কামারপুকুরে বালিকা পত্নীর অন্তরে, স্বামিত্বের নিত্য সম্বন্ধ

আঁকিবার নিবিড় প্রয়াস কোন কারণে ক্ষুব্ধ হয় নাই। তিনি প্রগাঢ় প্রীতির স্পর্শে দেহজ্ঞানবিরহিতা বালিকা বধূকে এমন করিয়া আপনার করিয়াছিলেন, যাহাতে অনাঘ্রাত পুষ্পের মত মাতাঠাকুরাণী আজন্ম ব্রহ্মচারিণী থাকিয়া ঠাকুরের অপার্থিব কামগন্ধহীন প্রেমের বৈজয়ন্তী উড়াইয়া গিয়াছেন। হৃদয় অপূর্ণ থাকিতে এই কঠোর তপস্যায় কেহ কখনও জয়ী হইতে পারে না। নারীহৃদয়ে পরিপূর্ণ তৃপ্তি দান করা কয়জন স্বামিদেবতার ভাগ্যে ঘটে, তাহা না বলিলেও চলে। পত্নীর মুখে হাসির বিদ্যুৎটুকু ফুটাইবার জন্য বিলাসের কত আয়োজন, দেহভোগের আবর্ত্তে কিরূপ চুবান খাইতে হয়, বিবাহিত জীবনে ইহা নূতন কথা নহে; কিন্তু ঠাকুর এই প্রাকৃত পথের ধার দিয়াও চলেন নাই, অথচ পত্নীর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও প্রেমের ইষ্টদেবতা হইয়া দাম্পত্যজীবনের অভিনব বেদী রচনা করিয়াছিলেন! ভবিষ্যজাতির সম্মুখে এই সিদ্ধ আদর্শ অন্য কোন দেশে সম্ভবপর হয় নাই, ইহা বুঝি ভারতেরই অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

পত্নীর প্রতি ঠাকুরের হৃদয়ের প্রবল আকর্ষণ দেখিয়া তন্ত্রসিদ্ধা ব্রাহ্মণী কুণ্ঠিতা হইয়াছিলেন। নারীজীবনের স্বভাবসঙ্কীর্ণতায় তিনি বিমূঢ়া হইয়াছিলেন, ঠাকুরের উন্নতজীবন নারীসংস্পর্শে পাছে অবনত হইয়া পড়ে, তাঁহার অটুট ব্রহ্মচর্য্য পাছে ভাঙ্গিয়া যায়—এই আশঙ্কায় ব্রাহ্মণী অকারণ সতর্ক হইতে গিয়া নিজের প্রতিষ্ঠা নষ্ট করিয়াছিলেন। ঠাকুর কোন কারণে সঙ্কল্পচ্যুত হইবার লোক ছিলেন না, স্বয়ং ভগবতী তাঁর জীবনযন্ত্র লইয়া পরিচালিত করিতেন, কোন্ অবস্থায় তাঁর ক্ষতি হইবে, তাহা তিনি অন্তর্দৃষ্টি দিয়া দেখিতে পাইতেন; কাজেই ব্রাহ্মণীর সতর্কতার উপদেশ তিনি এই সময়ে অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণী ঠাকুরকে পত্নীপ্রেমে মোহগ্রস্ত ভাবিয়া, এই

সময়ে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই। ইহার ফলে, তাঁহাকে চিরদিনের মত বিদায় লইতে হইয়াছিল। তন্ত্রসাধনার চরম সিদ্ধি করতলগত হওয়ায়, ব্রাহ্মণীর প্রয়োজন তখন শেষ হইয়াছে; কিন্তু এইজন্য ঠাকুর কোন দিন ব্রাহ্মণীর উপর অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন নাই। মাতাঠাকুরাণীকে দেহজ্ঞানের উপর উঠাইয়া, স্বামী-স্ত্রী-সম্বন্ধের নিগূঢ় তত্ত্বে প্রতিষ্ঠা করিয়া, সে যাত্রা তিনি পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

জীবনের শেষ যাহা, তাহা সাধিবার জন্যই পরবর্ত্তী চারিটি বৎসর তিনি কিরূপ একাগ্র হইয়া অবস্থান করেন, সে কথা পরে বলিব। ঠাকুরের অপ্রাপ্ত কিছু ছিল না, তবুও তিনি ষোড়শী পত্নীকে লইয়া যে লীলার অবতারণা করেন, তাহার মধ্যে যাহা আমরা পাই নাই, তাহার সঙ্কেতটুকুই আমাদের অন্তরে আশার সৃষ্টি করে; যে ঘটনা প্রত্যক্ষ তাহা ব্যক্ত, তাহা জীবনাভিব্যক্তির একটি অস্থায়ী পর্য্যায় মাত্র—যাহা অব্যক্ত রহিয়া গেল, তাহা আবিষ্কার করার প্রেরণাই ঠাকুরের দান, সে দান আদর্শের দায়ে হারাইলে চলিবে না।

ঠাকুরের বিবাহ সম্বন্ধে যুক্তি দেখাইতে গিয়া, শ্রদ্ধাস্পদ সারদানন্দ মহারাজ বলিয়াছেন—"সেইজন্যই বলি, এ অপূর্ব্ব যুগাবতারের বিবাহ করিয়া, একদিনের জন্যও শরীরসম্বন্ধ না পাতাইয়া, স্ত্রীর সহিত এই অদ্ভুত, অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রেমলীলার বিস্তার কেবল তোমারই জন্য।" (পৃঃ ১৪২, গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ) তবে কি ঠাকুর দেহভোগ বর্জ্জন করিয়া, ভবিষ্যতের জাতিকে তাঁর মত এই অভিনব দাম্পত্যজীবনের আনন্দভোগের পথ দেখাইলেন? স্বামীজী এই প্রসঙ্গে আরও লিখিয়াছেন, "বিবাহিত জীবনে যথাসাধ্য ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া স্ত্রী-পুরুষে ধন্য হইতে পারে, এবং

মহামেধাবী, মহাতেজস্বী, গুণবান্ সন্তানের পিতামাতা হইয়া"—ইত্যাদি। ঠাকুর কেন এই আদর্শ স্থাপন করিলেন না—তাহার উত্তর নাকি ঠাকুর নিজেই দিয়াছেন "এখানকার যা' কিছু করা সে তোদের জন্য। ওরে আমি ষোল টাং কর্‌লে, তবে যদি তোরা এক টাং করিস্।" অর্থাৎ তাঁহার এই অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য—ভবিষ্যতের জাতি যদি আংশিক ভাবেও পালন করে, তাহা হইলে হতশ্রী ভারতসমাজ বীর্য্যসমন্বিত হইবে। কিন্তু ভবিষ্যৎ যে তরুণ জাতির সর্ব্বস্ব, সে ভবিষ্যতের উপর ইহা অতিশয় অনাস্থার হেতু হয় ; আমরা অনাগতকে অধিকতর স্পর্দ্ধায় ও বীর্য্যে মণ্ডিত দেখিতে চাই, ঠাকুরের ষোল টাং যদি ভবিষ্যতে এক টাং করার অধিকার হয়, তবে আমাদের মুক্তির আশা কৈ ? তা' ছাড়া, ঠাকুরের এই বেদবিধি ছাড়া সাধনতত্ত্ব শুধু দাম্পত্য-জীবনে সাধ্যমত ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা ও সুস্থ ও সবল সন্তানাদির জন্ম দেওয়া, এই উদ্দেশ্যটুকু লইয়াই—ইহা বড় লঘু আদর্শের কথা ! আমাদের মনে হয়—ভারতের অধ্যাত্মসাধনযজ্ঞের পূর্ণাহুতি দেওয়ার সিদ্ধ নীতি ইহার মধ্যে নিহিত আছে ; ভারতসত্ত্বা সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া যে অমৃততত্ত্বের অন্বেষণে বৈরাগী, সেই পূর্ণতত্ত্বের অধিকারী হওয়ার দীক্ষা ঠাকুরের জীবনযন্ত্রে ধ্বনি তুলিয়াছে। অতি সন্তর্পণে আমরা সেই রহস্যটুকুই ব্যক্ত করিতে চাই—নিঃস্বার্থ সাধু-সজ্জনের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি।

* *
*

॥ ৪ ॥

নিত্যসিদ্ধ ও সাধনসিদ্ধ—ভাগবত পুরুষের জীবনে এই দুই প্রকার অবস্থা পরিদৃষ্ট হয়। নিত্যসিদ্ধ অবস্থা জীবসাধারণের নিকট দুর্ব্বোধ্য, সাধনসিদ্ধ অবস্থা সকলেরই অধিগম্য হইতে পারে। ঠাকুরের জীবনে এই দুই অবস্থার পরিষ্কার নিদর্শন ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর সাংসারিক অসচ্ছলতা দূর করার জন্যই কলিকাতায় আসিয়া কর্ম্মক্ষেত্র নিরূপণ করেন ও নিজের অবস্থা গুছাইয়া, কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে মানুষ করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে কলিকাতায় আনয়ন করেন। তারপর রাণী রাসমণির মন্দিরপ্রতিষ্ঠা হইলে, সুযোগ বুঝিয়া ঠাকুরের দারুণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও, তিনি তাঁহাকে শ্রীশ্রীজগদম্বার সেবাকার্য্যে নিয়োজিত করিয়া ভাবিলেন—একটা কাজের মত কাজ হইল।

কিন্তু ঠাকুরের দিন-দিন ভাবান্তর উপস্থিত হইল এবং তিনি একেবারেই কাজের বাহির হইলেন। এই সময়ে যে সকল দিব্য আচরণ তাঁহার জীবনে প্রকাশ পাইতে লাগিল, তাহা কোন বিশেষ বৈধী সাধনার উপর নির্ভর করিয়া নহে ; ভিতর হইতেই স্বতঃ-উৎসৃত প্রেরণার বশে তিনি যন্ত্রবৎ চালিত হইয়াছিলেন। এইরূপ চারি বৎসর কাল দিব্যোন্মাদ অবস্থায় থাকিয়া, তিনি কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলেন। এই অবস্থায় তিনি কামারপুকুরে আগমন করেন। ঠাকুরের ভাব দেখিয়া তাঁহার অবস্থা তখন যে সহজ মানুষের মতই হইয়াছে, ইহা সকলেই বুঝিয়াছিল ; তাঁহার কথায়, আচারে-আচরণে কোন অপ্রাকৃত অবস্থার লক্ষণ না দেখিয়াই, আত্মীয়-স্বজনেরা বিবাহের প্রস্তাব

তুলিয়াছিলেন। ঠাকুর ইহাতে কোনরূপ অসম্মতি প্রকাশ করেন নাই; বরং বিবাহে উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, নিজেই কন্যার সন্ধান বলিয়া দিয়াছিলেন। বিবাহ সম্বন্ধে তাঁহার এইরূপ সম্মতি দান আকস্মিক নহে অথবা বালকসুলভ সারল্যের অভিব্যক্তি নহে। ইহা ছিল তাঁর স্বরূপেরই সঙ্কল্প, নিত্যসিদ্ধ জীবনের অনিবার্য্য আত্মপ্রকাশ।

ঠাকুর নিজ বিবাহ করার উদ্দেশ্য লইয়া কখন-বা পরিহাসচ্ছলে কখনও-বা শাস্ত্রবিধি নির্দ্দেশ করিয়া অনেক কথাই বলিয়াছেন—যেমন ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালের বিবাহোপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী কামারপুকুর যাত্রা করিলে, তিনি বলরাম বাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—"আচ্ছা, আমার বিয়ে কেন হ'ল বল দেখি? স্ত্রী আবার কিসের জন্য হ'ল! পরণের কাপড়ের ঠিক নাই, আবার স্ত্রী কেন?" ঠাকুর দেহগত কোন তৃপ্তির হেতু বিবাহের মধ্যে খুঁজিয়া না পাওয়ায় যেন এইরূপ বলিতেছেন—কাজেই একটা কিছু বাহির করিতে হইবে তো, এইজন্য থালা হইতে ব্যঞ্জন তুলিয়া বলিলেন—"এই এ'র জন্য হয়েছে। নইলে কে আর এমন করে' রেঁধে' দিত বল!" ইহা যে নিছক পরিহাস, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। বিবাহ সম্বন্ধে শাস্ত্র ও সাধনগত আদর্শের কথা উত্থাপন করিয়া, বিবাহ করার অন্য উদ্দেশ্যের উল্লেখও তাঁর উক্তিতে পাওয়া যায়। তিনি বলিতেছেন—"বিয়ে করতে হয় কেন জানিস্? ব্রাহ্মণ-শরীরের দশ রকম সংস্কার আছে, বিবাহ তার মধ্যে একটা। ঐ দশ রকম সংস্কার ক্ষয় হ'লে তবে আচার্য্য হওয়া যায়।" আচার্য্য হওয়ার এইরূপ লৌকিক আচার পালন করিবার জন্য যে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন এরূপও নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। সাধনার হেতু দেখাইয়াও

বলিয়াছেন—"যে পরমহংস হয়, পূর্ণ জ্ঞানী হয়, সে হাড়ি-মেথরের অবস্থা থেকে রাজা-মহারাজা-সম্রাটের অবস্থা পর্য্যন্ত সব ভুগে দেখে এসেছে। নইলে ঠিক-ঠিক বৈরাগ্য আস্‌বে কেন? যেটা দেখি-নি, ভোগ করি-নি, মন সেইটা দেখতে চাইবে ও চঞ্চল হবে, বুঝলে? ঘুঁটিটা সব ঘর ঘুরে' তবে চিকে উঠে, খেলার সময়ে দেখ নি? সেই রকম।" (পৃঃ ১৩৫।৩৬, গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ)।

এই সকল সাধারণ যুক্তি প্রত্যয়ের বস্তু নহে, ইহা শ্রদ্ধেয় সারদানন্দ স্বামীও স্বীকার করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত, ঠাকুরের বিবাহের নিগূঢ় উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিতে গিয়া তিনি সুযুক্তিপূর্ণ অনেক কথাই বলিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বে তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ দিয়াছি, এই বিষয়ের বিশদ আলোচনা এই ক্ষেত্রে অনাবশ্যক।

আমরা বলি, বিবাহ—ঠাকুরের স্বরূপপ্রকাশ। নিত্যসিদ্ধ জীবনের সন্ধান পাওয়া মাত্র, তিনি লীলার সহচরীকে নিজেই খুঁজিয়া লইলেন। অবতার-মহাপুরুষগণ জগদ্ধিতায় জন্মগ্রহণ করেন, মায়া বা আসক্তি তাঁহাদের জীবনে এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্থান পায় না; তাই বিবাহের মধ্যে সাধারণতঃ যে প্রাকৃত ভোগের সংস্কার ক্ষয় হইয়া থাকে, ঠাকুরের জীবনে তাহার লেশ-মাত্র ছিল না—তিনি স্বরূপের রূপ ফুটাইয়া কল্পনির্দ্দিষ্ট পথে আগাইয়া চলিলেন। কি জাগতিক, কি সাধনসম্বন্ধীয় বা শাস্ত্রসঙ্গত কোন বিধানপালনের জন্য তিনি বিবাহ করেন নাই অথবা কোন আদর্শ স্থাপন করার উদ্দেশ্য লইয়া তাঁহার বিবাহ নহে—স্বরূপ ও স্বরূপশক্তি তো অভিন্ন নহে, একই সত্তা দুই দেহ ধরিয়া অবতরণ করেন, ঠাকুরের ক্ষেত্রেও ইহার অন্যরূপ হইবে কেন? তিনি যথাকালে মায়াশক্তির আবরণ ভেদ করিয়া যে মুহূর্ত্তে আত্ম-স্বরূপের সাক্ষাৎকার পাইয়াছেন, তৎক্ষণাৎ স্বরূপশক্তি-লাভে তাঁর দৃষ্টি

গিয়াছে; পাত্রীর সন্ধান যখন কোথাও পাওয়া গেল না, সকলে নিরাশ হইয়া বসিয়া পড়িল, ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া নিজের পাত্রীর সন্ধান দিয়া সকলকে আশ্বস্ত করিলেন। ঠাকুরের নিত্যসিদ্ধ অবস্থা বিবাহের ভিতর দিয়াই পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হইল। ঠাকুর এই সময়ে সহজভাবেই অবস্থান করেন। তিনি যেন একজন ঘোরতর সংসারী হইয়া উঠেন। নিত্যমুক্ত ভাগবত পুরুষ নিত্য মায়াকে লইয়া যখন ক্রীড়া করেন, তখন তাহা বড় উপাদেয় হয়। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর অলঙ্কার খুলিয়া লওয়া, সামাজিক প্রথানুসারে যোড়ে শ্বশুরালয় যাওয়া এবং সাংসারিক অসচ্ছলতা নিবন্ধন কর্ম্মস্থল হইতে দীর্ঘদিন দূরে থাকা বিধেয় নহে, এই বোধে দ্রুত বধূকে লইয়া কামারপুকুরে আগমন ও দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্ত্তন —যেন ঠাকুরের সংসাররক্ষার কত টান। সংসারের অভাব-অভিযোগের চরম ব্যবস্থার উদ্দেশ্য লইয়াই যে এইরূপ আচরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে কাহারও আর সংশয় ছিল না। জননী ও ভ্রাতা এই সময়ে তাঁহাকে আরও কিছুদিন কামার-পুকুরে থাকিবার কথা বলিলে, তিনি ভাবে জানাইলেন—এত অভাব-অনাঁটন, কলিকাতায় না আসিলে চলিবে কি করিয়া? তাঁর এই সময়ের এইরূপ প্রকৃতিস্থ অবস্থা দেখিয়া সকলেই তাঁহাকে উন্মাদ রোগ হইতে সম্যক্ নিরাময় বোধ করিলেন, তিনিও শীঘ্র দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া স্বকার্য্যে পুনঃপ্রবর্ত্তিত হইলেন।

এই সময়ে তাঁহার আবার এক মহাভাবান্তর হইল। সংসারের আবহাওয়ায় যেমনটি হওয়া ও করার প্রয়োজন ছিল, তাহা নিখুঁত-ভাবে সম্পন্ন করিয়া এইবার জগল্লীলার জন্য প্রস্তুত হইতে উদ্বুদ্ধ হইলেন। আমরা এই কালে দেখি—পূর্ব্বে তিনি যেমন আত্ম-প্রেরণাবশে আপনাকে চালিত করিয়া স্বরূপ উপলব্ধি

করিয়াছিলেন, এক্ষণে বৈধীসাধনা অনুসরণ করিয়া পূর্ব্ব-পূর্ব্ব অনুভূতিগুলি মিলাইয়া লইতে সেইরূপ যত্নপর হইলেন।

বিবাহের পূর্ব্বেই যদি স্বরূপ-লাভ হইয়া থাকে ত—তবে আবার তাঁহার সাধন করিয়া উহা পুনঃপ্রাপ্তির কি প্রয়োজন ছিল? এইখানেই এক অপূর্ব্ব রহস্য লুকাইয়া আছে। ঠাকুর আপনাকে পাইয়াছিলেন যে পন্থায়, যে সহজ আচারে, তাহা জীবকোটীর পক্ষে পাওয়া দুঃসাধ্য বুঝিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন—মায়া কেবল সংসারাসক্তি আশ্রয় করিয়া জীবের বন্ধন সৃষ্টি করে নাই; ঈশ্বর-প্রাপ্তির যে রাজবর্ত্ম ভারতের সাধনা, তাহাও মায়াবিরহিত নহে। যে সরিষা দিয়া ভূত ছাড়াইতে হইবে, সেই সরিষার ভিতর ভূত প্রবিষ্ট হইয়া থাকিলে, রোজা ভূতাবিষ্টকে নীরোগ করিবে কেমন করিয়া? তিনি বিবাহের পর, দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া এই মহাসমস্যার সমাধানে তন্ময় হইলেন।

আমরা এই নিত্যমুক্ত ভাগবত পুরুষকে অতঃপর দেখি—পূর্ব্বের মতই পূজা করিতে বসিয়াই আবার তাঁহার মন উচ্চভূমিতে আরোহণ করিয়া মাতা, ভ্রাতা, স্ত্রী, সংসার, কামারপুকুরের অভাব-অভিযোগের সকল কথাই বিষবৎ বর্জ্জন করিল। তিনি আবার বিষম গাত্রদাহে অস্থির হইলেন, চক্ষুঃ হইতে নিদ্রা দূর হইল। তিনি এই সময়ের নিজের অবস্থা বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন, "সাধারণ জীবের শরীর-মনে আধ্যাত্মিক ভাব, এইরূপ দূরে থাকুক, উহার এক-চতুর্থাংশ বিকার উপস্থিত হইলে, শরীর ত্যাগ হয়। দিবারাত্রির অধিকাংশ ভাগ, মার কোন-না-কোন রূপদর্শনাদি পাইয়া ভুলিয়া থাকিতাম, তাই রক্ষা, নতুবা এই খোলটা (নিজের শরীর দেখাইয়া) থাকা অসম্ভব হইত।" (১৮৯।৯০ পৃঃ, সাধকভাব, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা-

প্রসঙ্গ)। এই সময়ে আবার তাঁর চক্ষে পলক পড়িত না, শ্রীশ্রীজগদম্বার মূর্ত্তির দিক্ হইতে নিজের শরীরের দিকে চাহিতে ভয় হইত। দেহজ্ঞান তিরোহিত হইয়াছিল। প্রকৃতিস্থ হওয়ার জন্য স্থির চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখিতেন—পলক পড়ে কি না ? কিন্তু তবুও দৃষ্টি পলকহীন থাকিত। কাঁদিয়া বলিতেন, "মা, তোকে ডাকার ও তোর উপর একান্ত বিশ্বাস নির্ভর করার কি এই ফল হ'ল ! শরীরে বিষম ব্যাধি দিলি !" (পৃঃ ১৯০ সাধকভাব, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ)।

আপনার ইষ্টমূর্ত্তিচরণে আপনাকে নিঃশেষে দিয়াই, তিনি এই সময়ে ভবিষ্য মানবজাতির অবাধ মুক্তিপথের আবিষ্কারে যত্নপর হইয়াছিলেন। সমস্যানিরসনের ইহা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। শত স্বার্থের বিচ্ছুরিত রশ্মি গুটাইয়া, যখনই কেহ ইষ্টে আপনাকে লয় করিয়া দেয়, তখনই ভাগবত বিধান দিব্যছন্দঃ লইয়া অভ্যুত্থিত হয়। বাসনার কণা থাকিতে যে বিধি ও নীতি আবিষ্কৃত হয়, তাহা জীবের চিন্তা ও আদর্শে জড়িত বস্তু। অমিশ্রিত দিব্য বিধান পাওয়ার উপায়—আপনাকে লয় করা, বাসনা ও অহঙ্কার সম্যক্ প্রকার নিরসিতু করা। এই অপূর্ব্ব নীতি ঠাকুর তাঁর ধারাবাহিক জীবনের প্রতি ঘটনায় চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়াছেন—আমরা বাসনার কৃমি, সে দিব্য শিক্ষার অধিকারী হইলাম না !

তিনি দিবারাত্র মাতৃদর্শনে বিভোর থাকিয়া, আর একবার জগৎ ভুলিতে চাহিলেন। ভাগবত-হ্রদে এই সংস্কারযুক্ত দেহ-মন বার-বার চুবান খাইয়া তবে অমিলন হয়, আধার অবিশুদ্ধ থাকিতে ঈশ্বর-বিকাশ নিখুঁত হয় না। ঠাকুর কোন বিষয় অল্পে ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না, আপনার অনুভূতি তাই তিনি বার-বার পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন, সে পরীক্ষার সনাতন নীতি—ইষ্টে আপনাকে ডুবাইয়া

দেওয়া। যখনই কোন বিষয়ে খট্‌কা ঠেকিত, তখনই তিনি তাই সমাধিস্থ হইতেন। একবার দিব্য দর্শন পাইয়াই তিনি নিশ্চিত থাকিতেন না, সংসারের আব্‌হাওয়ায় যদি উহা মলিন হইয়া থাকে—তাই কথায়-কথায় শ্রীশ্রীজগদম্বাতে যুক্ত হইয়া পড়িতেন।

ডুবিতে-ডুবিতে নিজেকে সান্ত্বনা দিবার জন্যই বলিতেন "তা' যা' হবার হোক-গে ; শরীর যায় যাক ; তুই কিন্তু আমায় ছাড়িস-নি, আমায় দেখা দে, কৃপা কর ; আমি যে মা তোর পাদপদ্মে একান্ত শরণ নিয়েছি, তুই ভিন্ন আমার যে আর অন্য গতি একেবারেই নেই!" এই অসাধারণ, ঐকান্তিক নিষ্ঠা এমন প্রকট করিয়া, বাসনা ও অহঙ্কারকে পুড়াইয়া ছাই করার সিদ্ধ পন্থা ঠাকুরের জীবনে যেমন স্পষ্ট দিনের মত পরিষ্কার রূপে ফুটিয়াছে, এমন আর কোনখানে দেখা যায় না। তিনি শ্রীশ্রীজগদম্বার চরণে নিঃসঙ্কোচে ও নির্ম্মমভাবে অবতরণের আকাঙ্ক্ষাটিও বিসর্জ্জন দিয়া আবার নিঃস্ব হইলেন। কোথায় পড়িয়া রহিল সংসার—কোথায় চাপা পড়িয়া গেল নবপরিণীতা পত্নী! জগৎসংসার একবার চিদাকাশে ভাসিয়াছিল বলিয়াই তিনি নব সংসার-রচনায় অগ্রসর হইয়াছিলেন—আবার তাহা ডুবিয়া গেল। এই সংবাদ যখন কামারপুকুরে পৌঁছিল ; তখন সংসারে আবার বিষণ্ণতার ছায়া পড়িয়াছিল ; কিন্তু ঠাকুর আর ফিরিলেন না। সংসারপ্রসঙ্গ বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়া, তিনি চতুর্দ্দশবর্ষীয়া যুবতী পত্নীকে ব্রহ্মজ্ঞানে দীক্ষা দিবার জন্যই আরও কয়েকবার কামারপুকুরে যাতায়াত করিয়াছিলেন।

* *
*

॥ ৫ ॥

বেদাচার, বৈষ্ণবাচার অথবা শৈবাচার—সাধনার এই ত্রিমার্গ। ঠাকুর ইহার কোন পথই অবলম্বন করেন নাই, ইষ্টে আপনাকে সর্ব্বতোভাবে উৎসর্গ করিয়াই আত্মস্বরূপ উদ্ধার করিয়াছিলেন। ঠাকুরের জীবনদৃষ্টান্তে ইহাই প্রতীত হয় যে, ঈশ্বরপ্রাপ্তির জন্য কোন আচারই প্রয়োজনে লাগে না ; কিন্তু তিনি এই দ্বিতীয়বার জগদম্বার চরণে আপনাকে লীন করিয়া, আত্মস্বরূপ দিয়া ভারতের প্রচলিত ধর্ম্মসাধনার পন্থাগুলি সংহরণ করার নির্দ্দেশ পাইলেন। দক্ষিণেশ্বরের ইহাই উত্তম রহস্য।

যোগযুক্তির পথ—আচারসিদ্ধ নহে। আচার বা অনুষ্ঠান আকাঙ্ক্ষাপ্রসুত—কোন আকাঙ্ক্ষা থাকিতে ভগবল্লাভ হয় না। এই মহাতত্ত্ব অমিশ্র যোগাশ্রয়ী ভিন্ন অপরে বুঝে না। এই তত্ত্ব বুঝাইবার জন্যই কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠে গীতার ঝঙ্কার উঠিয়াছে। অবশ্য আত্মস্বরূপোপলব্ধির অধিকার অর্জ্জন করার জন্য জীবকে অনেক-কিছু করিতে হয় ; কিন্তু সেগুলি আশ্রয়ের শোধনসাধননীতি, পরন্তু আশ্রিত-লাভের উপায় নহে। জীবের অন্তরে যে শাশ্বত সত্তা নিত্য অবস্থান করিয়া

"ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভুতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া"

তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার একমাত্র উপায়—"ত্বমেব শরণং গচ্ছ"—গীতার এই নিগূঢ় নির্দ্দেশ দক্ষিণেশ্বরেই সিদ্ধ হইয়াছে।

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

ঠাকুরের জীবনে যোগের খাঁটি তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে প্রকটিত হইয়াছে। ভারতের ধর্ম্ম—যোগ, শাস্ত্রকথিত কোন আচার বা অনুষ্ঠান নহে। বরং সেগুলি বিসর্জ্জন দেওয়ার সাধনাই সিদ্ধির পথে চলার অব্যর্থ নীতি। ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপ-পুণ্য, ভাল-মন্দ, সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া ঠাকুর এই যোগশক্তির অবতার হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বিধান যোগের সিদ্ধ মন্ত্র; ঠাকুর যোগের সিদ্ধ মূর্ত্তি। নবযুগের মানবপ্রতিনিধি নরেন্দ্রনাথ ইহা মর্ম্মে-মর্ম্মে উপলব্ধি ও প্রত্যক্ষ করিয়াই আভিজাত্য, পাণ্ডিত্য ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ঠাকুরের শ্রীচরণে অর্পণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই অপূর্ব্ব মুক্তিমন্ত্র প্রচার করিবার জন্যই দণ্ডকমণ্ডলু হস্তে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঠাকুরকে ধরিয়াই তিনি আপনাকে পাইয়াছিলেন। আপনাকে হারাইয়া, আপনার যুক্তিতর্কবিজ্ঞানপ্রতিষ্ঠ দর্শন ডুবাইয়া, তবে ইহা অধিকার করিয়াছিলেন। ইষ্টে আত্মোৎসর্গ —ভারতের অদ্বিতীয় ধর্ম্ম। ঠাকুর যেমন "কালী ব্রহ্ম, ব্রহ্ম কালী" বলিয়া ডুব দিয়াছিলেন ইষ্টে, কোন আচারানুষ্ঠানের প্রতীক্ষা না রাখিয়া—নরেন্দ্রনাথও তদ্রূপ ধীরে-ধীরে এই একই নীতি অবলম্বন করিয়া জীবনের সত্য দর্শনে সার্থক হইয়াছিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে জোর করিয়াই আপনার মধ্যে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন। নরেন্দ্রের জ্ঞান বুদ্ধি, চুলচেরা বিচার সে দিন সে টানে মাথা তুলিতে পারে নাই। তাঁহার ইংরাজী জীবনীলেখক তাই লিখিয়াছেন :

"Then he became re-Hinduised, he became the disciple ; he became one with his master's ideals. Aye, he saw that which the master saw. He saw the

Brahman Itself, becoming himself the seer, the sage, the saint, the man of God".

এই আত্মসমর্পণযোগের পথে অন্তরায়—ভারতের আচার। ধর্ম্ম-সাধনা করিতে হইলেই অহঙ্কার বিসর্জ্জন দিতে হয়। আচারে-অনুষ্ঠানে ইহা দূর হয় না। যতক্ষণ আমি থাকে, ততক্ষণ যাহা হয়, তাহা নিজের শক্তি ও সমৃদ্ধিকেই বৃদ্ধি করে, ভগবান্‌কে লীলায়িত করে না। স্বামীজী বুঝিয়াছিলেন—"Each soul is potentially divine, the "goal" is to manifest this divinity within." ইহাই স্বরূপ-প্রকাশ।

ভগবানে আপনাকে দিয়া না ফুরাইলে, ক্ষুদ্র অহং সংসার-কর্ম্মে যেমন অর্থ, বনিতা প্রভৃতি লাভ করিয়া মোহগ্রস্ত হয়; ধর্ম্মসাধনায় অধ্যাত্মশক্তি অর্জ্জন করিয়া তদনুরূপ আত্মগরিমাই বৃদ্ধি পায়। ঈশ্বর-লাভের একমাত্র উপায়—আত্মসমর্পণ; ঠাকুর তাহা সিদ্ধ করিয়াছিলেন এবং স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হইয়াই নবসংসার-রচনায় উদ্যোগী হইয়াছিলেন।

যোগের দুইটী স্তর আছে। ইষ্টে আবিষ্ট হইয়া অহঙ্কারহীন অবস্থা এবং আবিষ্টতার বন্ধন ছিন্ন করিয়া অপরিসীম অদ্বয় ব্রহ্মময় হওয়া। দক্ষিণেশ্বরে সাধনার প্রথম পর্য্যায়ে ঠাকুরের সবখানি ইষ্টময় হওয়ার জন্যই আকুল হইত, পাষাণ-জড়প্রতিমা তাঁর নিষ্ঠা-শ্রদ্ধার স্পর্শে চৈতন্যময়ী হইয়া ধরা দিয়াছিল। তিনি শ্রীশ্রীজগদম্বার সহিত অভিন্ন-চিত্ত হইয়াই দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। ইষ্টমূর্ত্তির সহিত সম্পূর্ণ যুক্তির পরিচয় তাঁর জীবনের ছত্রে-ছত্রে প্রকাশ পাইয়াছে।

যে কোন সমস্যাই সম্মুখে উপস্থিত হউক না কেন, তিনি নিজের স্বতন্ত্র মন দিয়া তাহা বিচার করিতে পারিতেন না; কেন-না, মনের লয় হইয়াছিল, সব কথাই তিনি শ্রীশ্রীজগদম্বাকে জিজ্ঞাসা করিতেন। যখন ভিতর শূন্য বোধ হইত, জীবনের সুর বাঁধিবার জন্য তিনি মন্দিরে

গিয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিতেন, সব কথার সদুত্তর মায়ের মুখ দিয়াই বাহির কবিতেন। এমন "তন্মনা, তদ্ভক্ত, তদ্‌যাজী" যোগের চরম লক্ষণ আর কোথায় দেখা গিয়াছে ?

বিবাহ করিয়া ফিরিয়া আসার পর, তাঁর ভাবান্তর হইল। যুক্তির পথ দিয়াই তিনি নূতন পর্য্যায়ে উঠিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন—পরবর্ত্তী সাধনার মধ্য দিয়া তিনি দুইটি শ্রেয়ঃ বিধান করিলেন। প্রথমতঃ, সাধনার আবর্ত্ত বিদীর্ণ করিয়া তিনি জগৎকে দেখাইলেন—আচারের মধ্যে যে সিদ্ধি, তাহা তিনি সমর্পণ-যোগেই আয়ত্ত করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, ইষ্টমূর্ত্তির চতুর্ব্যূহ ভেদ করিয়া তিনি স্বয়ং ঈশ্বরতত্ত্বে আরূঢ় হইলেন। সঙ্কল্প-বিকল্প ত্যাগ করিয়া নির্ব্বিকল্প যোগাধিষ্ঠিত হওয়ার পরই, তিনি জীবের উৎসর্গ অকুণ্ঠিতচিত্তে গ্রহণ করিয়া মুক্তিদাতা হইলেন। অতঃপর এই প্রসঙ্গেরই আলোচনা করিব।

প্রথমেই, তন্ত্রসাধনার কথা। তন্ত্রসিদ্ধা ব্রাহ্মণী এই সময়ে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনিই বলেন—তিনজন মহা-পুরুষকে তন্ত্রসাধনা দিবার প্রত্যাদেশ পাইয়া দুইজনের দীক্ষা সমাপন করিয়াছেন, এইবার তৃতীয় জনের সাক্ষাৎকার পাইলেন। এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, যে সিদ্ধমন্ত্রে ব্রাহ্মণী ঠাকুরকে দীক্ষা দিলেন, সেই একই মন্ত্র ও সাধন অপর দুইজনকেও দিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহাদের জীবনে তন্ত্রের পূর্ণসিদ্ধি লাভ করা দূরে থাকুক, তাঁহারা সাধন-প্রসূত শক্তির গর্ব্বে আত্মঘাতী হইয়াছিলেন। এ কথা আমরা শুনিয়াছি, ইষ্টলাভের পরিবর্ত্তে অনিষ্টের বোঝা বহিয়াই তাঁহারা শেষ হইয়াছেন। ঠাকুর ব্রাহ্মণীর নিকট নিজের সাধনবৃত্তান্ত অকপটে প্রকাশ করিলেন—কিরূপ অপার্থিব দর্শনসমূহ তাঁহাকে সর্ব্বদা তন্ময়

করিয়া রাখে, দেখিতে-দেখিতে ভাবাবেশে আপনা হইতেই দেহাবয়ব কিরূপ বিকলাঙ্গ হইয়া যায়, দারুণ গাত্রদাহে তিনি কিরূপ অস্থির হইয়া পড়েন, চক্ষের পলক পড়িতে চাহে না প্রভৃতি। ব্রাহ্মণী অসাধারণ বিদুষী ছিলেন। তন্ত্র ও সহজিয়া সাধনায় তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি ঠাকুরের লক্ষণসমূহ অতিশয় আগ্রহসহকারে শুনিয়া, প্রসন্নচিত্তে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—ইহা কোনরূপ ব্যাধি নহে, এরূপ মহাভাব কেবলমাত্র শ্রীমতী রাধারাণী ও গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জীবনেই প্রকাশ পাইয়াছিল। ঠাকুর যে একজন অবতার-পুরুষ, এ কথা ব্রাহ্মণীই সর্ব্বপ্রথমে প্রকাশ করেন। ঠাকুর এই কথা শুনিয়া বালকের মত আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ভৈরবীর সহিত ঠাকুরের নিবিড় পরিচয় এক অদ্ভুত ঘটনার দ্বারা সংসিদ্ধ হইল। পঞ্চবটীর নিকটে ভৈরবী বন্দনাদি শেষ করিয়া, ইষ্টদেব রঘুবীরের সম্মুখে অন্ন নিবেদন করিবার জন্য ধ্যানস্থ হইলেন। ঠাকুর এই সময়ে ভাবাবিষ্ট হইয়া কি এক অমানুষিক আকর্ষণে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং "অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায়, কি করিতেছেন সম্যক্ না বুঝিয়া, অপরের শক্তিবলে প্রযুক্ত নিদ্রিত ব্যক্তির ন্যায়, ব্রাহ্মণীর নিবেদিত সম্মুখস্থ খাদ্যসকল গ্রহণ করিতে লাগিলেন।" (পৃঃ ২০০, সাধকভাব, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ)

এইরূপ অবস্থা তাঁহার একাধিকবার হইয়াছে। ব্রাহ্মণী অকস্মাৎ ঠাকুরের এইরূপ আচরণ দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন; কিন্তু ঠাকুর পুনঃ-প্রকৃতিস্থ হইয়া নিতান্ত ক্ষুব্ধ ও অপ্রতিভ হইয়া যখন বলিলেন "কে জানে বাবু, কেন এমন বেসামাল হইয়া এইরূপ কার্য্য সকল করিয়া বসি!" তখন ব্রাহ্মণী সজল চক্ষে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন— "ঠিক করিয়াছ, আমি বুঝিয়াছি কে এরূপ করিয়াছে এবং কেন

করিয়াছে, আমার পূজা এতদিনে সার্থক হইল!" এই বলিয়া নিত্য-পূজার বিগ্রহ-মূর্ত্তি রঘুনাথ শিলাটিকে গঙ্গাগর্ভে বিসর্জ্জন দিলেন। ব্রাহ্মণী তাঁহার ইষ্টমূর্ত্তি ঠাকুরের আধার আশ্রয় করিয়া যে জীবন্ত দর্শন দিয়াছেন, তাহা নিঃসংশয়ে বুঝিয়াই এইরূপ করিয়াছিলেন।

এই ঘটনায়, ঠাকুরের সহিত ব্রাহ্মণীর সম্পর্ক ঘনীভূত হইল। ঠাকুর কোন বৈধী শাস্ত্রসঙ্গত পথ আশ্রয় না করিয়া, নিজের একাগ্রতা ও অধ্যবসায়-বলে যাহা করিয়াছেন তাহা যথেষ্ট নহে এবং এইজন্যই ঠাকুরের যে সব যোগজ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে তিনি সংশয়বশতঃ ব্যাধির আশঙ্কা করিতেছেন, ইহা বুঝিয়া ব্রাহ্মণী শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট পথে ঠাকুরকে তন্ত্রসাধনায় ব্রতী করিতে সঙ্কল্প করিলেন। শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া ঠাকুরের সাধনা বিপথে চালিত হয় নাই—ইহা না বলিলেও চলে। আমরা দেখিব, তন্ত্রোক্ত সাধন ও তাহার সিদ্ধি তিনি ইচ্ছামাত্র সমাপ্ত করিয়াছেন। এইজন্য ইহা ভৈরবীর ধারণা হইলেও, ঠাকুরের পক্ষে ইহা কোন মতে প্রযুজ্য নহে। সাধনার পথে সিদ্ধির অব্যর্থতা পূর্ব্বে সপ্রমাণ হয় নাই, তিনি অন্য দুইজন মহাপুরুষকে বৈধী সাধনায় পরিচালিত করিয়া সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। সাধনার পথে ঠাকুরের অবতরণ সাধনার গৌরববৃদ্ধির হেতু নহে, অথবা বিনা সাধনায় ঈশ্বরপ্রাপ্তি অসম্ভব, ইহাও এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হয় নাই। কেন-না, তন্ত্র-পথের চরম সিদ্ধি এই সাধনার পূর্ব্বেই তিনি আয়ত্ত করিয়াছিলেন—যাহা দেখিয়া স্বয়ং ব্রাহ্মণীও বিস্মিত হইয়াছিলেন। নির্ব্বিকল্প সমাধির পথে তিনি অনায়াসে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনদিন কূটস্থ চৈতন্যে অবস্থান করিয়া তিনি তোতাপুরীকেও স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। ঠাকুর সর্ব্বধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া ইষ্টে সর্ব্বস্ব উৎসর্গ যোগের মাহাত্ম্যপ্রদর্শনের জন্যই

প্রচলিত সাধনাচার অবলম্বন করিয়াছিলেন। কন্দুক লইয়া বালক যেরূপ অনায়াসে ক্রীড়া করে, ভারতের এই সকল গতানুগতিক কঠোর সাধন-পন্থা তিনি তেমনি অনায়াসে অতিক্রম করিয়া আত্মসমর্পণ-মন্ত্রের জয় ঘোষণা করিলেন।

ব্রাহ্মণীর উদ্দেশ্য—ঠাকুরকে সরূপে প্রতিষ্ঠা করা ; ঠাকুর যাহাতে নিজের শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন, তাহার আয়োজন করা। তিনি ঠাকুরের প্রীতি ও অনুরাগদর্শনে তাঁহাকে শিষ্য-বোধেই এইরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ঠাকুর তন্ত্রের সারতত্ত্ব ব্রাহ্মণীর নিকট হইতে সংহরণ করিয়া, ইহার উদযাপনের জন্যই ব্রাহ্মণীর নির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইতে যত্নপর হইলেন। এই ক্ষেত্রেও তিনি ইষ্ট-মূর্ত্তি শ্রীশ্রীজগদম্বার আদেশ ব্যতীত কার্য্য করেন নাই। আত্মসমর্পণের সাধনায়, আনুগত্যই হইতেছে প্রথম ও শেষ মন্ত্র।

ব্রাহ্মণী পঞ্চমুণ্ডীর আসন নির্ম্মাণ করিলেন। গঙ্গাহীন প্রদেশ হইতে এই মুণ্ড আনিতে হয়, ব্রাহ্মণী তাহাই করিলেন। সাধনার পথ দুর্গম ও বীভৎস, এই ধারণা লইয়াই সাধককে বোধহয় তন্ত্রসাধনায় ব্রতী হইতে হয়। শৃগাল, সারমেয়, বানর, সর্প ও চণ্ডালের মুণ্ড স্থাপন করিয়া পঞ্চমুণ্ডীর আসন করাই বিহিত। কেহ-কেহ শত নরমুণ্ড স্থাপন করিয়া আসন নির্ম্মাণ করেন। তন্ত্রে শব-সাধনারও নির্দ্দেশ আছে। চণ্ডালের অপঘাত মৃত্যু হইলে, সেই শবের উপর বসিয়া, যথাবিধি মন্ত্র-জপ করিতে পারিলে, সিদ্ধিলাভ হয়। যাহা হউক, ব্রাহ্মণী-রচিত পঞ্চমুণ্ডীর আসনে বসিয়া, ঠাকুর কয়েক মাস দিবারাত্র মন্ত্র জপিতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মণী তন্ত্রোক্ত দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া যথাবিধি সাধন আরম্ভ করিলেন। তন্ত্রে ত্রিবিধ আচারের কথা উল্লিখিত আছে :

"পশুবীরদিব্যভাবা দেবতামন্ত্রসিদ্ধিদাঃ।"

পশু, বীর ও দিব্যভাবে দেবতাদিগের মন্ত্র সিদ্ধ হয়। কিন্তু

"পশুভাবঃ কলৌ নাস্তি দিব্যভাবোঽপি দুর্লভঃ।
বীরসাধনকর্ম্মাণি প্রত্যক্ষাণি কলৌ যুগে ॥"

কলিযুগে পশুভাব ও দিব্যভাব নাই, কাজেই বীরভাবের আচার সাধিতে হয়। পশ্বাচার ও দিব্যাচারের লক্ষণ তন্ত্রে এইরূপ আছে :

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং স্বয়মেবাহরেৎ পশুঃ।
ন শূদ্রদর্শনং কুর্য্যাৎ মনসা ন স্ত্রিয়ং স্মরেৎ।"

পূজার জন্য পত্র-পুষ্প-ফল-জল স্বয়ং আহরণ করিবে, কদাচ শূদ্র দর্শন করিবে না, মনেও রমণী স্মরণ করিবে না। বলা বাহুল্য, কলিযুগে এই কঠোর বিধিপালন দুঃসাধ্য—ইহাই পশ্বাচার।

"দিব্যঞ্চ দেবতাপ্রায়ঃ শুদ্ধান্তঃকরণঃ সদা।
দ্বন্দ্বাতীতো বীতরাগঃ সর্ব্বভূতে সমঃ ক্ষমী ॥"

দিব্যাচারে দেবতার ন্যায় শুদ্ধান্তঃকরণ ও সুখ-দুঃখ, শীত-গ্রীষ্মে সমতা-পরায়ণ, রাগদ্বেষবর্জ্জিত, সর্ব্বভূতে সমদর্শী, ক্ষমাশীল ব্যক্তিই অধিকারী।

কাজেই কলিযুগের মানুষ—যে সকল বৃত্তি তাহাদের অপরিহার্য্য তাহা দিয়াই তাহাদিগকে তন্ত্রসাধনে প্রবৃত্ত হইতে হয়।

"বীরসাধনকর্ম্মাণি পঞ্চতত্ত্বোদিতানি চ ॥
মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মুদ্রা মৈথুনমেব চ।

বীরসাধনকর্ম্মে পঞ্চতত্ত্ব মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন সহযোগ কথিত আছে। শাস্ত্রোক্ত এই সাধনমার্গে ব্রাহ্মণী ঠাকুরকে ব্রতী করিলেন। ঠাকুর তন্ত্র-সাধনা সম্বন্ধে অল্প কথাই প্রকাশ করিয়াছেন ; যাহা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, তদ্দ্বারাই আমরা ইহার মর্ম্মোপলব্ধি করিতে পারিব।

* *
*

॥ ৬ ॥

"ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলম্ জ্ঞানমূর্ত্তিম্"—জ্ঞানমূর্ত্তি সাধকের ইষ্ট-স্বরূপ লক্ষ্য। ইহাই জ্ঞানঘন গুরুমূর্ত্তি। ব্রহ্মানন্দ তুরীয় বস্তু হইলে, বিষয়চৈতন্যযুক্ত জীবের চিত্ত ইহা অবধারণ করিতে অসমর্থ হইবে; তাই যাহা তুরীয় ভাব (abstract) তাহা প্রত্যক্ষ বস্তুতন্ত্র (concrete) করিয়া ধরিতে হয়। ভারতের সাধনরহস্যের ইহা সনাতন বিধি।

ঠাকুরের ইষ্টদেবী—কালী। এই ইষ্টবস্তুতে তাঁর প্রগাঢ় নিষ্ঠা ছিল এবং তিনি ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়াছিলেন। ইষ্টই ছিল তাঁর বস্তু, আর সব অবস্তু রূপেই তিনি দেখিতেন।

প্রাকৃত ভোগরত জীবের পক্ষে ইহা কমঠব্রতীর মত সঙ্কীর্ণ হইয়া আত্মরক্ষার ব্যবস্থা ভিন্ন অন্য কিছু মনে হইবে না; কেন-না, প্রকাশ-বিরোধী নীতি জীবনের যে ধর্ম্ম নহে, তাহা প্রমাণ করার অধিক যুক্তি প্রয়োজন হয় না। কিন্তু আমাদের মনে রাখিতে হইবে—ভারতের অবতার-পুরুষগণ একটা অপার্থিব তত্ত্বের আবিষ্কারের জন্যই যুগে-যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন এবং সেই তত্ত্ববস্তুর সম্যক্ প্রতিষ্ঠা না হইলে অর্থাৎ যে বস্তুর সংসর্গে ইন্দ্রিয়-মন প্রযুক্ত হইবে তাহা ব্রহ্মবস্তু-রূপে সম্যক্ উপলব্ধি করিতে না পারিলে, তাঁহারা তাহা গ্রহণ করেন না, করিতে পারেন না। সাধকজীবনে বস্তুর আসক্তিত্যাগের জন্য কোন-কোন ক্ষেত্রে ইহা লইয়া নাড়াচাড়া চলে; কিন্তু সিদ্ধ জীবনে সব কিছু পরিত্যক্ত হয়। নিরাসক্তির যে বিরক্তি, তাহাই বৈরাগ্যের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে।

সিদ্ধ জীবনের ইহাই চরম কথা নহে। বৈরাগ্য জীবনের চরম প্রকাশ হইলে, ঠাকুর পরম অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া বিবাহ করিবেন কেন? তিনি চাহিয়াছিলেন জীবন, এ চাওয়া ভগবানেরই চাওয়া; কিন্তু তাঁহার নিজের জন্য নহে। "শ্রীশ্রীজগদম্বা তাঁহাকে জগতের কল্যাণের জন্য শরীর পরিগ্রহ করাইয়াছিলেন।"

বুদ্ধিগ্রাহ্য সত্য আর সত্যকে জীবনের সবখানি দিয়া উপলব্ধি —এ দুয়ের তুলনা হয় না। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" শব্দতঃ এইরূপ শাস্ত্রজ্ঞানে অনেক জ্ঞানপাপীই ব্রহ্ম-বোধে অনেক কিছু করিয়া থাকেন। নিতান্ত হঠকারী ছাড়া ভাবের ঘরে চুরির কথা মর্ম্মে-মর্ম্মে উপলব্ধি যে না হয়, এরূপ নহে। এরূপ লীলার পরিণাম প্রাকৃত জীবনের অভিব্যক্তি ব্যতীত যে অন্য কিছু নহে, কালের নির্ম্মম বিশ্লেষণে তাহা চিরদিন প্রমাণিত হইয়াছে। ঠাকুরের জীবনে প্রকৃতির এক তিল চুরি চলে নাই, তাঁর দিব্য বিচারশক্তি দ্বারা অভাগবত বস্তুর অনুভব মাত্র তিনি সে জীবনের পথ হইতে মুখ ফিরাইয়াছেন—কে চাহে জীবনের গতানুগতিক ধারা, যদি তাহা ঈশ্বরানন্দের প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তি না হয়!

সর্ব্ববস্তুই তো ভাগবত। ইহা দার্শনিক তত্ত্ব। আমার ভগবান্ সেখানে যদি মূর্ত্ত না হন আমার দৃষ্টিতে—আমার রূপ, রস, গন্ধের অনুভূতিতে, তবে সে আস্বাদ কাকপুরীষের মতই ঘৃণার বস্তু হইবে। কামকাঞ্চন ও ব্রহ্ম অভেদস্বরূপ—জগদম্বা ঠাকুরকে দেখাইলেন না; তিনি যাহা দেখাইলেন না, ঠাকুর তাহা দেখিবেন কেন? অনেকের মনে হইবে, ইহা পূর্ণ জীবন নহে। আমরা বলি, কোন আদর্শ সিদ্ধ করাই যে পূর্ণ জীবনের লক্ষণ তাহা নহে; ভগবান্ যাহা চাহেন জীবন দিয়া তাহাই যদি সাধিত হয়, তবেই জীবনের সার্থকতা—

ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ করাই জীবনের উদ্দেশ্য। কি তাঁহার ইচ্ছা, কি তাঁহার ইচ্ছা নহে, তাহা বুঝিয়াছে সেই—যে সর্ব্ব কামনা ও আসক্তি ইষ্টচরণে উৎসর্গ করিয়া নির্দ্বন্দ্ব ও নিঃস্ব হইয়াছে। এমন কাঙাল ভারতে অনেক জন্মিয়াছে ; তার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। ঠাকুরও রাখেন নাই কিছু, তাই তাঁর জীবন অনুসরণ করিয়া আমরা দেখিতে পাই—ভগবানের চাওয়া কি ! যুগে-যুগে ধরণীকে ধন্য করিবার জন্য ভগবান্ দিব্য-রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন, ঠাকুরের জীবনে সেই একই উদ্দেশ্য প্রকট হইয়াছে। দেখিবার কথা—তিনি কতটুকু তাহা সিদ্ধ করিলেন ও ভবিষ্যতে আমাদের জন্য বাকিটুকু সম্পন্ন করার কি বীর্য্য রাখিয়া গেলেন।

অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা অনেক ক্ষেত্রে আমাদের সত্যদর্শনে বাধা দেয়। মৃতকে মৃত বলিয়া অনুভব করাই প্রশস্ত, তাহা হইলে ভবিষ্যৎ অমিশ্র ও নিরঙ্কুশ হয়। কিন্তু প্রাচীন ভারতের প্রতি আমাদের অবিচারিত মমতায় আমরা নবযুগের দান প্রকৃত ভাবে গ্রহণ করিতে পারি না ; অমৃতের সঙ্গে মৃত্যুর বীজ মিশ্রিত করি।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ ভারতের ধর্ম্মপন্থাগুলিকে সংহরণ করিতে চাহিয়াছিলেন। বর্ত্তমানের পূজা—ভবিষ্যতের ভিত্তি। অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা—অভিজ্ঞতার্জ্জনের জন্যই ; অনুসরণে জাতিকে স্থবির করিয়া তুলে, সম্মুখে গতির পথ রুদ্ধ হয়। আগে চলার পথে এমন বাধা আর দুটী নাই।

আমরা দেখি—উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম যুগে যে মহাধর্ম্মপ্লাবনের জয়-শঙ্খ মহাত্মা রামমোহনের কণ্ঠে প্রথম ধ্বনি তুলে, বাংলায় তাহা ধীরে-ধীরে নানা আধারের মধ্য দিয়া একই ভাবে ঝঙ্কার দিয়া ঘোষিত হইতেছে। ব্যক্তিত্বের অহমিকা—ভগবানের অখণ্ড ইচ্ছা-

শক্তিকে ব্যক্তিবিশেষের সম্পদ্‌জ্ঞানে ইহার নিরবচ্ছিন্ন ধারাকে খণ্ডিত করিয়া ভাগবত মহিমাই খর্ব্ব করে। ঠাকুরের অমৃতশীতল কণ্ঠ—রুদ্রের ধ্বংসবিষাণের নামান্তর ; তাঁর প্রশান্ত সৌম্য মূর্ত্তি—সংহার-লীলার ছদ্মবেশ। কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে শব্দমন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছিলেন—সর্ব্ব ধর্ম্ম বিসর্জ্জন করার তিনি আজিও আমাদের নিকট বাণীমূর্ত্তি ; কিন্তু ঠাকুর বিসর্জ্জন-যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা—কালীকে ইষ্টস্বরূপ লক্ষ্যে রাখিয়া, তাঁর করাল মূর্ত্তি প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন ভক্তের বেশে, সরল উদার সন্তানরূপে। তিনি করিয়াছেন কি!

শত-শত মার্জ্জিতবুদ্ধিসম্পন্ন ও আভিজাত্যশালী ব্যক্তিবর্গ যে ধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়া বিরোধের আগুন জ্বালিলেন, সংঘাতে-সংঘাতে হতবল হইয়া বিশাল হিন্দুসমাজ হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িলেন, আজ তাঁহাদের অকপট আত্মত্যাগ ঐতিহাসিক ঘটনার চিহ্ন রক্ষা করিয়াই নিষ্প্রভ—আর ঠাকুর! ছুঁৎমার্গী বাঙ্গালীর সমাজে শ্রীক্ষেত্র সৃষ্টি করিলেন। যে সুবর্ণবণিকের ছায়া স্পর্শ করিলে বাংলার সমাজ-পুরুষ শিহরিয়া উঠিতেন, ব্রাহ্মণের শির সেখানে ভূনত হইল ; শূদ্রের কণ্ঠে বেদের ঋক্ উঠিল। মূর্ত্তিপূজার স্তর-ভেদ দেখাইয়া, নিজের মস্তকে বিল্বদল চাপাইয়া তিনি ঘোষণা করিলেন "অহম্ ব্রহ্মাস্মি"—আর ঈশ্বর-জ্ঞানের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিলেন নরদেহে। "মানুষী-তনুমাশ্রিতং" নারায়ণকে তিনি জাগাইয়া তুলিলেন। তাই স্বামীজির কণ্ঠে নূতন সঙ্গীতধ্বনি উঠিল : "......Brahman has to be awakened in the heart of the people and then New Vedas will spring up in the land of Bharata."

স্বামীজী লোকের মনোরঞ্জনে চিত্ত দিতে অসমর্থ ছিলেন। হৃদয় তাঁহার পূর্ণ ছিল ইষ্টে। এই যোগ স্তিমিত হইলে ঠাকুরের নামে

লোকের চাওয়াই হয় তো সিদ্ধ করিতে হইবে; ভগবানের চাওয়া কিন্তু নূতন বেদসৃষ্টি। ঠাকুর অতীতকে গ্রাস করিয়াছেন; তাই অতীতের নরকঙ্কাল যাদুঘরে রক্ষা করিয়াই জাতিকে নিশ্চিন্ত হইতে হইবে।

অতীতের প্রতি মমতাবশতঃই পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ ঠাকুরের তন্ত্রসাধনার মূল কথা জ্ঞানতঃ অথবা অজ্ঞানতঃ চাপা দিয়া বলিয়াছেন—"এই সকল অনুষ্ঠানের সাফল্য দেখিয়া—যথার্থ সাধককুল কোন্ লক্ষ্যে চালিত হইবে, তাহার নির্দ্দেশ প্রাপ্ত হইয়া যেমন উপকৃত হইয়াছে, তন্ত্র-শাস্ত্রের প্রামাণ্যও তেমনি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া ঐ শাস্ত্র মহিমান্বিত হইয়াছে।"

ভক্তিশাস্ত্রে আছে "শাস্ত্রীকুর্ব্বন্তী শাস্ত্রাণি" ইত্যাদি—অর্থাৎ সিদ্ধ মহাপুরুষগণ শাস্ত্রকে পুনর্জ্জীবিত করেন, তীর্থের মহিমা উদ্ধার করেন। এই সাধুজনোচিত পন্থার প্রতি সম্মানপ্রদর্শন মহত্ত্বের পরিচয়, সন্দেহ নাই; কিন্তু ঠাকুরের তন্ত্রসাধনায় তেমন আস্থা হয় নাই। আমার বিশ্বাস—কোন মহাপুরুষই, যিনি তন্ত্র-সাধনা যথারীতি সম্পন্ন করিয়া আজ লোকগুরুর আসন অধিকার করিয়াছেন, তিনি স্পর্দ্ধা করিয়া তদীয় শিষ্যবর্গকে তন্ত্রপথে চলিতে বলিবেন না। এই পথে সত্যের সন্ধান মিলিলে, তাহা গোপন রাখার কারণ থাকিত না। ইহা নিছক আসক্তিপরায়ণ ব্যক্তির ধর্ম্মের নামে আসক্তির সেবা—মন্দের ভাল হইলেও সত্যব্রতীর গ্রহণীয় নহে।

ঠাকুর তন্ত্রোক্ত পথে চলিয়াই যে ঘৃণাত্যাগে সমর্থ হইয়াছিলেন বা দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা নহে; ইহা তাঁহার পূর্ব্ব-সিদ্ধি। শ্রীশ্রীজগন্মাতার চরণে আত্মসমর্পণ সুসিদ্ধ করিয়া, তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন "চৈতন্যঘনা, জগদম্বার বরাভয়করা মূর্ত্তি······ঐ মূর্ত্তি

হাসিতেছে, কথা কহিতেছে”—(পৃঃ ১১৯, সাধকভাব, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ) তন্ত্র-সাধনার পূর্ব্বেই ধ্যানে বসিলে—শরীর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গ্রন্থি সকল বন্ধ হইয়া যাইত—তিনি দেখিতেন উজ্জ্বল জ্যোতিস্তরঙ্গে সমুদয় পদার্থ পরিব্যাপ্ত, চক্ষুঃ চাহিয়াও তাহাই দেখিতেন। মায়ের পদে আত্মদানেই তিনি ঘৃণাহীন হইয়াছিলেন; জিহ্বাগ্রে বিষ্ঠা-স্পর্শ তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মেথরের গৃহমার্জ্জনে নিজের দীর্ঘ কেশের ব্যবহার—অকুণ্ঠ হৃদয়ের লক্ষণ নহে কি? কাঙালীভোজনের ভুক্তান্ন প্রসাদ জ্ঞানে গ্রহণ, উচ্ছিষ্ট পত্র মাথায় করিয়া বহন, এইগুলি সর্ব্বজীবে সমজ্ঞানেরই সাক্ষ্য প্রদান করে।

ভারতের তন্ত্র, সহজিয়া, বেদান্তের সপ্তভূমিকার সাধন প্রভৃতি শাস্ত্রীয় আচারানুষ্ঠানই প্রত্যক্ষ ভাবে যোগের পথকে বিঘ্নসঙ্কুল করিয়াছে। ঠাকুর সিদ্ধ জীবনে এইগুলির পর-পর অনুসরণ করিয়া ইহাই প্রমাণ করিয়াছেন; পরন্তু কোথাও ইহাদের মহিমার বৃদ্ধি করেন নাই। আর সত্যই যদি আমাদের ভাগবত জীবন আজ প্রয়োজন হইয়া থাকে, তবে জীবে ও ভগবানে যোগ-পথকেই পরম জ্ঞানে দেশের সম্মুখে ধরার দরকার। অতীতের প্রতি অসম্মান ইহাতে হয় না। আমরা অভিজ্ঞতা চাই, কিন্তু জীবন দিতে পারি না—কেন-না সে জীবন বাঁধা পড়িয়াছে ভগবানের পাদপদ্মে; এই যুক্তজীবনের সরল প্রকাশে, তন্ত্র, সহজিয়া ও মায়াবাদের যুক্তি ও অনুষ্ঠান খণ্ড-খণ্ড হইয়া খসিয়া পড়িয়াছে। ইহা কি অবধারিত নহে যে, যে জীবের অন্তরাত্মা সর্ব্বতোভাবে ভগবানের সুরে বাঁধা, যার বাহ্য দেহ-মন-প্রাণ ভগবানের চাওয়া ভিন্ন অন্য চাওয়া বরণ করিতে অসমর্থ, সে অনায়াসেই শাস্ত্রোল্লিখিত অনুষ্ঠানবিধি অতিক্রম করিবে? তন্ত্রসাধনার এক-একটী অনুষ্ঠান—ভৈরবী যত গভীর ভাবপূর্ণ করিয়াই ঠাকুরের সম্মুখে

উপস্থাপিত করুন না, তাহা যে যোগযুক্ত জীবনের সম্মুখে আদৌ কঠিন ব্যাপার নহে, তাহা সপ্রমাণ করিয়া ঠাকুর ভবিষ্য ভারতকে যোগের পথই নির্দ্দেশ দিয়াছেন। সত্যের পথ—নানা শাস্ত্রমহিমার কীর্ত্তনে মানুষের মনে ভ্রান্তি ও দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি করে। ঠাকুর একমাত্র ইষ্ট-স্বরূপে আপনাকে উৎসর্গ করার ফলে—অন্যের নিকট ইহা যতই কঠোর ও দুঃসাধ্য বলিয়া অনুভূত হউক, যোগীর কেন তাহা হইবে! সে যে প্রত্যেক বস্তু ভিতরের চাওয়া ধরিয়াই আস্বাদনে অভ্যস্ত। তাই উলঙ্গ-রমণীর কোলে বসার অনুরোধপালন লোকদৃষ্টান্তস্বরূপ বিস্ময়কর ঘটনা হইলেও, ঈশ্বরযুক্ত যোগীর নিকট ইহা তুচ্ছ ব্যাপার—ঠাকুর অনায়াসে ইহা করিলেন। ভৈরবীর চৈতন্যসম্পাদনের জন্যই তিনি দেখাইলেন—যে হৃদয় ভগবানে পূর্ণ, তাহা সামান্য রমণীসম্ভোগলালসায় চঞ্চল হইবার নহে। মনে মুখে এক না হইলে, বলির ছাগের মত কাঁপিতে-কাঁপিতেই হয় তো তন্ত্র-সাধককে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয়। অশেষ ভোগের পর, ইন্দ্রিয়শৈথিল্যবশতঃ অথবা তন্ত্র-সাধনায় সিদ্ধ পুরুষ, এই খ্যাতি-লাভের সঙ্কল্প অনেক সাধককে এই সকল তন্ত্রোক্ত অনুসন্ধানে পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ করে। ইহা কি ঈশ্বরশাস্ত্র, না সাধনার সঙ্কেত?

ঠাকুর নরকপালে ভর্জ্জিত মৎস্য জিহ্বা দিয়া গ্রহণ করিলেন; আমমাংস দেখিয়া দুর্গন্ধে একবার ইতস্ততঃ করিলেও, তিনি রুদ্র মূর্ত্তিতে ইহাও আস্বাদ করিলেন; 'কারণ' নাম শ্রবণ করিয়াই তাঁহার চেতনায় জগৎকারণ ভাসিতে লাগিল—শেষ পরীক্ষা, আসক্তির পরিণাম-সম্ভোগ; ভৈরবী সে দৃশ্যও দেখাইলেন, ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন। প্রাকৃত জীবের স্নায়ু-পেশী হয় তো এই দৃশ্যদর্শনে পশুজনোচিত লম্ফ দিয়া উঠিত; কিন্তু ঠাকুর কেন, আধুনিক যুগে যাঁহারা উচ্চজ্ঞানানুশীলনে বুদ্ধিবৃত্তিকে কিছুমাত্র মার্জ্জিত করিয়াছেন,

তাঁহারাও অনায়াসে ইহা দেখিয়া উদাসীন থাকিতে পারিতেন। তন্ত্রকে এমন করিয়া উলঙ্গমূর্ত্তিতে লোকচক্ষে ধরাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। তিনি যে দেখিয়াছিলেন—ভারতের সাধনা অনাবশ্যক আড়ম্বরের মধ্যে ঢাকা পড়িয়াছে; মানুষের আসক্তিই ধর্ম্মের নামে শাস্ত্র ও অনুষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছে। যোগী গিরিশচন্দ্র সত্যই বলিয়াছেন—নেশা একেবারে ছাড়িলে সঙ্কট ব্যামো হওয়ার আশঙ্কা যাহারা করে, তাহাদের নেশায় তখনও আসক্তি আছে। আমরাও বলি—যতদিন প্রাকৃত ভোগে জীবের ঝোঁক থাকে, ততদিন সে এই সকল বিধিকে প্রশ্রয় দেয় এবং এই পথের যাত্রীসংখ্যা অধিক বলিয়া, মানুষের প্রতিভা তদুপযোগী শাস্ত্ররচনাদ্বারা শ্রদ্ধার আসন পায়। শিব-বাক্যের এই মাহাত্ম্য চূর্ণ করার সঙ্কেত তাঁর জীবনের প্রতি ছত্রে পাই। নির্ম্মম তরুণ জাতিকে তাই ঠাকুর রামকৃষ্ণের জীবনদান অমিশ্রভাবে গ্রহণ করিয়া, নূতন বনিয়াদের উপর ভারতের ধর্ম্ম ও সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে বলি—আমরা নূতন বেদই রচনা করিতে চাই।

* * *

॥ ৭ ॥

তারপর, ঠাকুরের সহজিয়া-সাধনার কথা। সাধনা-বস্তুটী আসলে মানুষের চেষ্টা ভিন্ন অন্য কিছু নহে। জীবনের চরম সমস্যার সমাধানে জীবের অধ্যবসায় যখন হার মানে, তখনই আত্মসমর্পণের ভাব বোধগম্য হয়। এইজন্য ভারতে অধ্যাত্মজীবনের ইতিহাস দেখিলে—এই পথে মানুষের দুর্জ্জয় প্রয়াসই লক্ষিত হয়। এই অলৌকিক তপস্যা পুঞ্জীভূত হইয়া, ইহবিমুখ লোকের চিত্ত এমন ভাবে আকর্ষণ করে যে, ইহার প্রভাব হইতে মুক্তি পাওয়া একপ্রকার অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। এই সাধননীতির যে চরম সার্থকতা তাহা আর আমাদের উপলব্ধি হয় না, সাধনার আবর্ত্তেই জীবনের অন্তহীন হাবুডুবু খাওয়াই যেন আজ পরম পুরুষার্থ।

বাংলায় মায়াবাদের আবর্ত্ত স্থান পায় নাই ; কিন্তু তন্ত্র ও সহজিয়া সাধনার বিস্তৃত অনুশীলন বাংলার মত আর কোথাও হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। হয় তো ইহার প্রাকৃত অনুষ্ঠান নীতি মানুষের প্রকৃতি আহরণ করিয়া সাধনার নামে প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে পারে। কিন্তু পরম লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার নিমিত্ত এই সাধনায় এমন সরল ভাবে আত্মদান করিতে বাঙ্গালী ভিন্ন অন্য কেহ ভরসা করে নাই।

মায়াবাদী বিপত্তি বর্জ্জন করিতে গিয়া আত্মঘাতী হইয়াছেন। মোক্ষপ্রাপ্তি জীবনের ধর্ম্ম নহে ; এইজন্য জীবনের মূল্য দিয়া জীবনের অতীত বস্তুর আকাঙ্ক্ষা আত্মনাশ ভিন্ন অন্য কিছু নহে বলিয়াই আমাদের ধারণা।

বাঙালী চাহিয়াছিল জীবন। এইজন্য বাংলায় তন্ত্র-সহজিয়া ধর্ম্মসাধনার বিশিষ্ট পন্থা বলিয়াই স্থির হইয়াছিল। বাঙ্গালী জীবনের সন্ধান যেমন নিখুঁত ভাবে দিতে পারে, এমন কোন জাতি পারে না ; ইহার কারণ- তন্ত্র ও সহজিয়ায় প্রাণের শিল্প বিশেষ ভাবেই অবগত হওয়া যায়। বাঙ্গালীর সাধনায়—তত্ত্বের লয় না হইয়া তত্ত্বজ্ঞানই প্রকট হইয়া উঠে ; নির্ব্বাণ ও মোক্ষবাদের পন্থা নির্দ্দেশ অপেক্ষা বাঙ্গালী জীবনকে ভাগবত করার সঙ্কেত স্পষ্ট করিয়া দিতে পারে ; কিন্তু মায়াবাদের প্রভাব ও অন্যদিকে উঞ্ছ ভোগবৃত্তির আকাঙ্ক্ষা সমানভাবেই জীবনের সত্যাবিষ্কারে আমাদের প্রতিহত করিয়াছে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের জীবনসাধনায় আমরা এই তৃতীয় পন্থাই অতি পরিষ্কাররূপে দেখি, এবং এইজন্যই জাতিগঠনের মূলে দক্ষিণেশ্বরের দান যে অব্যর্থ অমৃত, সে বিষয়ে সংশয় নাই। এই তীর্থের রজঃস্পর্শে মানুষ যদি মায়াবাদের কাটা খাদে ঝাঁপ দিয়া কৃতার্থ হইতে চাহে, তাহা জীবনের জয় দিতে দুর্গম পথ বরণ না করার পঙ্গুত্ব ভিন্ন আর কি বলিব ?

মনে রাখিতে হইবে যে, ঠাকুরের বিবাহের পর দক্ষিণেশ্বরে এই সকল সাধনার অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছিল। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, সহজ প্রেরণাবশে, জগদম্বার চরণে আত্মদান পূর্ণ করিয়া, দিব্যদৃষ্টি লইয়াই তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন এবং দ্বিতীয়বার নিজ বাটীতে গিয়া পত্নীর হৃদয়ে প্রণয়বীজ বপন করার পূর্ব্বে, আপনার সবখানিকে বিশুদ্ধ করিবার জন্য এই সকল বৈধী সাধনার তিনি আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বুদ্ধের নির্ব্বাণবাদ বাংলার পলি-মাটিতে বিকৃত ভোগবাদ সৃষ্টি করিল ; ইহা প্রকৃতির প্রতিশোধ। বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার প্রভাবে সমাজের

ভিত্তি পর্য্যন্ত শিথিল হইয়াছিল। ভারতের ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মই নবতন্ত্র প্রচার করিয়া ইহার সামঞ্জস্য বিধান করে। কুলাচার রক্ষা করিয়া তন্ত্র-সাধনা আগম-নিগম সাহায্যে নূতন ভাবে বৈদিক ধর্ম্মেরই অবতারণা। সহজিয়া ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্ম্ম—সম্যক্ পরিণতি সিদ্ধ না হওয়ায়, ইহা লইয়া বেদান্তের সহিত সামঞ্জস্যবিধানের প্রয়াস লক্ষিত হয়; কিন্তু তাহা কষ্ট-কল্পনা। বাংলার সহজিয়া ঠিক কোথা হইতে অঙ্কুরিত হইল, তাহার নির্দ্ধারণ সহজ নহে। আমাদের মনে হয়, জীবনের সত্য, তার সতেজ স্বভাব-গতি মানুষের কল্পিত ধর্ম্মকে উপেক্ষা করিয়া সহজিয়ার ভিতর দিয়া আপনাকে ফলাইয়া তুলিতে চাহিয়াছে; এবং এই নব গঙ্গোত্রীপ্রবাহে বাংলার চণ্ডীদাসই সর্ব্বপ্রথমে অভিষিক্ত হইয়া, জীবনকে অমৃতময় করার সঙ্কেত দিয়া গিয়াছেন।

ব্রাহ্মণ চণ্ডীদাস বৈধী সাধনা আশ্রয় করিয়া ইষ্টমূর্ত্তির আরাধনায় তন্ময় ছিলেন। তাঁর স্বপ্নেও ছিল না ভোগবৃত্তি—নিষ্ঠাচারী ব্রাহ্মণ শাস্ত্র-শাসন অমান্য করেন নাই; কিন্তু ভাগবত প্রেরণাই মূর্ত্তিমতী হইয়া তাঁহার হৃদয়ে নব বেদ সৃজন করিল। তিনি কাণ পাতিয়া শুনিলেন:

*　　*　　*　　*

"সহজ ভজন　　　করহ যাজন
ইহা ছাড়া কিছু নয়।
ছাড়ি জপ-তপ　　　করহ আরোপ
একতা করিয়া মনে।
যাহা কহি আমি　　　তাহা শুন তুমি
শুনহ চৌষট্টি সনে॥"

যে আরোপ বেদান্ত দূর করিতে চাহে, সেই আরোপ জীবনকে

সার্থক করার হেতু স্বরূপ হইল। বুঝি কাঁটা দিয়াই কাঁটা দূর করিতে হয়; কিন্তু বেদান্তের ভ্রান্তি দূর হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে জীবনের সার্থকতা ঘুচিয়া যায়। সহজিয়ায় তাহার উল্টা—বরং নিত্য জীবনের সন্ধান মিলে। বেদান্তের সাধনা বিশেষতঃ নীরস, সহজিয়া চৌষট্টি রসের সঙ্গে সাধিতে হয়; সে রস বসুতে-গ্রহেতে একত্র করিয়া ভজন করিতে হয়। বাণের সহিত সর্ব্বদা সংগ্রাম করাই সহজের রীতি, চৌষট্টি রসের মধ্যে বাণের সঙ্কেত দিয়াই পঞ্চরসের অবতারণা করা হইল। ইহাই মধুর রসের উপাসনা। মদন, মাদন, শোষণ, মোহন ও স্তম্ভন, পঞ্চরসের এইগুলি আকৃতি। প্রাকৃত প্রাণ শিহরিয়া উঠে, চণ্ডীদাসও স্তম্ভিত হইয়াছিলেন; কিন্তু রজকিনীর আশ্বাস আতঙ্ক দূর করিল:

"আমি ত আশ্রয় হই বিষয় তোমারে কই
রমণ কালেতে গুরু তুমি।
আমার স্বভাব-মন তোমার রতি-ধ্যান
তেঞি সে তোমায় গুরু করি মানি॥
সহজ মানুষ হব রসিক নগরে যাব
থাকিব প্রণয়-রস-ঘরে।
শ্রীরাধিকা হবে রাজা হইব তাহার প্রজা
ডুবিব রসের সরোবরে॥"

অবশ ইন্দ্রিয় যদি ব্যভিচার ঘটায়, তাই রজকিনী বলিলেন:

"শুন চণ্ডীদাস প্রভু, ভজন না হয় কভু
মনের বিকার ধর্ম্ম জানে।
সাধন শৃঙ্গার-রস ইহাতে হইবে বশ
বস্তু আছে দেহ বিদ্যমানে॥"

মনের বিকার থাকিলে ধর্ম্ম হয় না—প্রথমে ইন্দ্রিয়াদি বশ হইবে সাধন-শৃঙ্গারে, সে কথা পরে বলিব। রজকিনীর আশ্বাস-বচন পাইয়া, জীবনের তলে ডুবিয়া চণ্ডীদাস অমৃত আহরণ করিলেন; মানুষের মধ্যে দেবতার সন্ধান পাইয়া উচ্চ কণ্ঠে মানুষেরই জয় দিলেন :

"চণ্ডীদাস কহে—শুন হে মানুষ ভাই!
সবার উপর মানুষ সত্য
তাহার উপর নাই।"

জীবনকে এমন করিয়া নিত্য বোধে বরণ করার দুঃসাহস ইহার পূর্ব্বে আর কেহ করে নাই। চণ্ডীদাসের মন্ত্র নবদ্বীপচন্দ্রের জীবন-যন্ত্রে মূর্চ্ছনা তুলিল। চণ্ডীদাসের পিরীতি-মন্ত্র সূত্রের মত এতদিন দুর্ব্বোধ্য ছিল, শ্রীগৌরাঙ্গ তাহার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করিলেন, বাঙ্গালী রসতত্ত্বের আস্বাদ পাইল।

"প্রেমরস নির্য্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গে ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ॥"

শ্রীগৌরাঙ্গের অবতরণের এই দুই হেতু বৈষ্ণব মহাজনেরা উল্লেখ করেন। এক প্রেমরসের আস্বাদন, আর এক রাগমার্গে লোকের অর্থাৎ মানুষের মধ্যে ভক্তির প্রচার বা আকর্ষণ।

বোধ হয়, নিজের স্বার্থ লইয়া এমন নিঃস্ব কাঙাল আর কেহ হয় নাই। সকলেই আসিয়াছেন জগতে মুক্তি দিতে, মুক্তিদানের প্রতিশ্রুতিই তাঁদের জগতে আগমন ও স্থিতির কারণ। জগন্মুক্তি সহজ নয় ও অনতিকাল মধ্যে হয় তো সাধ্যও নয়; তাই বিলম্ব, তাই যুগে-যুগে ঠাকুরের দায়ে পড়িয়া আনাগোনা। নবদ্বীপচন্দ্র কিন্তু নিত্য-স্থিতির প্রয়োজন আবিষ্কার করিলেন। তাঁর মুখের বাণী নূতন ঋকের মত বাঙ্গালীকে নিত্য জীবনের আশ্বাস দিল; নশ্বর জগৎ নূতন

চক্ষে নিত্য বৃন্দাবনের স্বপ্ন রচনা করিল। যাহা ছিল কল্পনারও দুঃসাধ্য, তাহা বস্তুতন্ত্র রূপে সিদ্ধ করার অব্যর্থ নীতি আবিষ্কৃত হইল। এই চারিশত বৎসর ধরিয়া তাই বাংলায় জ্ঞানে-অজ্ঞানে ব্রজবাসি-গঠনের আয়োজন চলিয়াছে। জাতি হইলেই তো দেশের প্রয়োজন। জীবন যদি নিত্য হয়, দিব্য হয়, তবেই ধরিত্রী অমৃতময় স্বর্গ হইবে। অঙ্কশাস্ত্রের মত অটুট যুক্তি দিয়া জগতের দিকে মানুষের চিত্ত ফিরাইবার এই সত্য প্রেরণা জীবনের পক্ষে বড় আশা নহে কি?

চণ্ডীদাস যে শৃঙ্গার-রসে অভিষিক্ত করিয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বশ করার অব্যর্থ নির্দ্দেশ দিয়াছেন—নবদ্বীপচন্দ্রের অসাধারণ বৈরাগ্য তাহার জ্বলন্ত নিদর্শন। তিনি শৃঙ্গার-রসের বর্ণনা করিতে গিয়া জীবন দিয়া দেখাইলেন:

"রসময়-মূর্ত্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার।
সেই রস আস্বাদিতে হৈল অবতার॥"

আশ্রয় ও বিষয় লইয়া সহজিয়া-তত্ত্ব। বিষয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ; আশ্রয় জীবজগৎ, নিখিলপ্রকৃতি। বিষয়ের আস্বাদ আশ্রয়-তত্ত্বে নিত্য উপহিত, নতুবা সৃষ্টির সার্থকতা কি? এই চেতনা লুপ্ত হয় বলিয়াই বিরহ; তাই মিলনের সঙ্গীত, কৃষ্ণতত্ত্বের রসগীতা। বাংলায় এই অমৃত-নির্ঝর নিরন্তন ঝরিতেছে, তাই বাংলা নবযুগ-সৃষ্টির মহাতীর্থ।

রসের মধ্যে মাধুর্য্য রসই প্রধান। ঠাকুর তন্ত্রসাধনার পর, রসমার্গে কি ভাবে বিচরণ করিয়াছিলেন, তাহাও সমালোচকের দৃষ্টি লইয়াই আমরা দেখিব। কেন-না, যাহা নিঃশেষ করা দরকার, তাহা সশ্রদ্ধ দর্শনের ফলে পুনরাবর্ত্তন করে। বিষয় ও আশ্রয় সত্য এই দুয়ের মধ্যে সংযোগসাধনের যে প্রয়াস তাহা যদি চির অসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে একই বস্তুর বার-বার অবতারণা মূর্খতার পরিচয়; আর যদি

এই যোগ অতীতে সিদ্ধ না হইয়া থাকে, অবশ্যই আমাদের তাহার জন্য প্রাণপণ করিতে হইবে। কিন্তু বিচার করিতে হইবে, কোন বিশেষ সাধনা যে নির্দ্দিষ্ট সাফল্য দিতে চাহে, তাহা ব্যর্থ হইয়াছে, অথবা ঐ পথে উহা আদৌ সিদ্ধ হইবে না—অন্ধ শ্রদ্ধা যেন ভবিষ্যতের পথে অন্তরায় সৃষ্টি না করে। অতীতের অপেক্ষা বর্ত্তমানের সাধ্য অল্প—এইরূপ প্রত্যয় নিজের প্রতি নিদারুণ অশ্রদ্ধাজ্ঞাপক। এই দুইটি বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আমরা ঠাকুরের মধুর রসের সাধন, তাঁহার অন্তরতম উদ্দেশ্য ও ইহার পরিণাম দেখিয়া ভবিষ্যতের পথ নির্দ্ধারণ করিব।

* * *

॥ ৮ ॥

অবতার-পুরুষগণের জন্মগ্রহণের অধ্যাত্মহেতু পৌরাণিক যুগ হইতে একটি বিশিষ্ট প্রথা অবলম্বন করিয়া নিরূপিত হইয়া থাকে, যুগোপযোগী করিয়া ইহা বিবৃত হয়। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব সম্বন্ধে যেমন কয়েকটী হেতু প্রদর্শন করা হইয়াছে; ঠাকুরের জীবন আলোচনা করিতে গিয়া, পূজনীয় সারদানন্দ মহারাজও ইহার অন্যথা করেন নাই।

মহাপুরুষগণের জন্মগ্রহণ যে আকস্মিক ও অর্থহীন নহে, ইহা সপ্রমাণ করার এই প্রচেষ্টা তাঁহাদের জীবনের প্রত্যেক কর্ম্মটীর নিগূঢ় উদ্দেশ্য যুক্তি সহকারে প্রকাশ করিয়া থাকে। ঠাকুরের রসমার্গের সাধনা সম্বন্ধেও কয়েকটী কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে।

ঠাকুরের দান একান্ত নিরপেক্ষ ভাবে ভবিষ্য জাতিকে গ্রহণ করিতে হইলে, এই বিষয়ের আলোচনা অবান্তর নহে; বরং অবিকৃত সত্যকে আমরা ইহা দ্বারা অতি সহজে, ভক্তি ও অনুরাগের আতিশয্যে যে অন্ধ হৃদয়াবেগ, তাহার প্রভাব হইতে দূরে থাকিয়াই মাথায় তুলিয়া লইতে সমর্থ হইব।

ঠাকুর তন্ত্র-সাধনার পর রস-সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তন্ত্র-সাধনায় শাক্তদের মধ্যে দুই প্রকার ভাব পরিদৃষ্ট হয়। ভৈরব-ভাব ও সন্তান-ভাব। স্বীয় পুরুষত্বে রুদ্রকে আরোপ করিয়া, তন্ত্রসাধক শিব-ভাবে আত্মশোধন করেন। আরোপ স্বরূপের রূপ নয়; কাজেই জীবত্বের যে সংস্কার, সাধনকালে তাহাই পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ পায়।

লক্ষ্য সমুন্নত বলিয়াই, তন্ত্র-সাধকগণের আচরিত সমাজবিরুদ্ধ গর্হিত কার্য্যগুলি গোপনে অনুষ্ঠিত হইলেও, ইহা হেয় বলিয়া তাঁহারা বোধ করেন না। পঞ্চ-মকারের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা যতই দেওয়া হউক, তান্ত্রিক চক্রানুষ্ঠানে সাধকগণের প্রবৃত্ত্যনুযায়ী পশুত্বের অভিনয় যে হইয়া থাকে, তাহা বোধ হয় এই সকল সাধনার নিগূঢ় রহস্য অবগত হওয়ার সুযোগ যিনি পাইয়াছেন, তিনি অস্বীকার করিবেন না। তান্ত্রিক চক্রে পরস্ত্রী বলিয়া কোন কথা নাই—চক্রানুষ্ঠানকালে প্রত্যেক পুরুষই শিবের অংশ, প্রত্যেক নারীই শিবশক্তি; অতএব শিবত্বলাভ না হইলে, জীবত্বের যে রিরংসা তাহা মদ্য-মাংসের ইন্ধনে যে অনুদ্যত থাকে, তাহা নহে। ঘোরতর সংযমীর পক্ষে সর্ব্বক্ষেত্রেই প্রবৃত্তিদমন অসাধ্য নহে; এইরূপ ক্ষেত্রেও তাই অনেকে আত্মপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিন্তু তাঁহাদের চক্ষের সমক্ষে যে বীভৎস রসের সৃষ্টি হয়, তাহা কোনকালে কোন উচ্ছৃঙ্খল সাধকের জীবনকে যে অমৃতময় করিবে, তাহা কল্পনা করাও যায় না।

ঠাকুরের তন্ত্র-সাধনা এই ভাবের ছিল না। তিনি ছিলেন সন্তান-ব্রতী। শক্তির পরিচয় লওয়ার পক্ষে, এই ভাবই জীবের পক্ষে শ্রেয়ঃ। তবে হিন্দুজাতির বীরত্বের কথা বটে, যে প্রাণ-শিল্পের গভীর রহস্য-দ্বার উদ্ঘাটন করিবার জন্য, প্রাণের উদ্দাম কামনাকে ধর্ম্মনীতির বন্ধনে অবাধ স্বেচ্ছাচারের মধ্য দিয়াও তাঁহারা শোধনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত, পঞ্চ-মকার-সাধনার অন্য অনেক উদ্দেশ্য থাকিতে পারে; তাহা ঘুরাইয়া নাসিকা প্রদর্শন করা ভিন্ন অন্য কিছু নহে। এজন্য ইহার অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

ঠাকুর জন্মসিদ্ধ। তাই তাঁর সাধনাও ছিল সিদ্ধ। তিনি তাঁর ইষ্টমূর্ত্তির নিকট আপনাকে সর্ব্বতোভাবে উৎসর্গ করিয়া দেখিয়া-

ছিলেন—ইষ্টময় জগৎ। আর তাঁর ইষ্ট "স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলাঃ জগৎসু—" কাজেই ভবিষ্যতে বিবাহিতা পত্নীকেও এই জগদম্বার প্রতিরূপ দেখিয়া, তাঁর চরণে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করিয়াই তিনি কৃতার্থ হইয়াছিলেন। সে কথা পরে বলিব।

মাতৃ-ভাবের সাধনায় বিভোর হইতে পরিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি মনুষ্যত্বের সংস্কার হইতে মুক্তি পাইয়াছিলেন এবং এই রক্ষা-কবচের প্রভাবেই, পরবর্ত্তী যুগে অসংখ্য প্রলোভন তৃণ-লোষ্ট্রের মতই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণীর তন্ত্র-সাধনার দীক্ষা তিনি এই কারণেই অবহেলায় সমাপ্ত করিতে ক্ষম হইয়াছিলেন।

স্বর্গত সারদানন্দ মহারাজ বলেন—ব্রাহ্মণী তন্ত্র-শাস্ত্রে সুনিপুণা হইলেও, তাঁর মধ্যে সহজিয়ার অভিজ্ঞতাও ছিল; কাজেই ব্রাহ্মণীর সংসর্গে আসিয়া ঠাকুর এই রসতত্ত্বের সাধনায় যে আকৃষ্টা হইবেন, ইহা অসঙ্গত কথা নহে। ব্রাহ্মণী সর্ব্বপ্রথমে ঠাকুরের নিকট রসতত্ত্বই প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু তখন তাঁর মাতৃভাব ব্যতীত অন্য ভাব সমর্থন করার অবস্থা ছিল না। কাজেই সুচতুরা ব্রাহ্মণী ঠাকুরের বিরক্তি দেখিয়া ব্রজগোপী ভাবের সঙ্গীত ও হাবভাব সম্বরণ করিয়া, ঠাকুরকে তন্ত্রমতে দীক্ষা দিয়াছিলেন। ঠাকুরের সিদ্ধ মাতৃভাব অনুকূল আশ্রয়ে সমধিক সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। তন্ত্র-সাধনায় সিদ্ধ হইলে, ব্রাহ্মণী রসতত্ত্বের বাৎসল্য-রসেই ঠাকুরকে অভিষিক্ত করেন। ঠাকুর তন্ময় হইতেন যখন ভৈরবীর কণ্ঠে মাতৃবন্দনা মূর্চ্ছনায় গগন-পবন মুখরিত করিত। কখনও বা মাতৃভাবোন্মত্তা ব্রাহ্মণী শ্রীমতী যশোদার ন্যায় স্নেহবিগলিত হৃদয়ে ঠাকুরের মুখে সর-ননী ধরিতেন। কল্পসিদ্ধ সাধনতত্ত্বের মর্য্যাদাই ইহাতে প্রবুদ্ধ হইয়াছিল। জগদম্বা তাঁহাকে কোন অবস্থায় বে-চালে পা ফেলিতে দিতেন না—ঠাকুর

ব্রাহ্মণীর সংসর্গে আসিয়া ইষ্টকে ভাব হইতে জীবনে লাভ করিলেন, প্রাণ পর্য্যন্ত ইষ্টময় হইল।

ইহার পর রসতত্ত্বের সাধন অনিবার্য্য। রস হৃদয়ের বস্তু। প্রাণ দিব্য হইলে, হৃদয় বৃন্দাবন করিতে হয়—ঠাকুরের রসমার্গে পদক্ষেপ করার কারণগুলির মধ্যে ব্রাহ্মণীর প্রভাব যে সর্ব্বপ্রথম, "লীলাপ্রসঙ্গে" ইহা উক্ত হইয়াছে।

রসতত্ত্বে অবতরণ করার দ্বিতীয় কারণ—তিনি বৈষ্ণব কুলে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কামারপুকুর অঞ্চলে বৈষ্ণব সাধনার প্রচলন খুব বিস্তৃতভাবেই ছিল। তিনি বাল্যকাল হইতেই ইহাতে অনুরাগ দেখাইতেন, তন্ত্র-সাধনার পর বৈষ্ণব ভাবেই উদ্‌বুদ্ধ হওয়া এইজন্য বিচিত্র কথা নহে।

তৃতীয় কারণ—ঠাকুরের মধ্যে পুরুষ ও স্ত্রী এই উভয় ভাবের অপূর্ব্ব সম্মিলন ছিল, স্ত্রী-ভাবের সাধনা রাগ-সাধনায় বিধিপূর্ব্বক প্রবর্ত্তিত হওয়ার পূর্ব্বেও তাঁহার জীবনে পরিদৃষ্ট হইয়াছিল।

এই কারণত্রয় ব্যতীত অন্য কারণ প্রদর্শন করা ধৃষ্টতা বলিতে হইবে, কিন্তু উপায় নাই। হিন্দুজাতির অপরূপ সাধন-তত্ত্বের নিগূঢ় মর্ম্ম ইষ্টের মহিমা ও ঐশ্বর্য্যবোধ অক্ষুণ্ণ রাখার দায়ে চিরদিন গৌণ ভাবের আবরণে ঢাকা দেওয়া হইয়াছে। সকল রহস্যের নিগূঢ় কারণ মুখ্যতঃ প্রদর্শন না করায় কালক্রমে ইহা অস্পষ্ট ও বিকৃত হইয়া উঠে, যত দিন যায় অতীতের প্রতি আমাদের অশ্রদ্ধাই বাড়ে। ভারতের কৃষ্ণ-তত্ত্ব আজ অনেক ক্ষেত্রে অবর স্তরের সামগ্রী। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি সাহিত্যিকের আদরের বস্তু হইলেও, মার্জ্জিতবুদ্ধি অনেক তরুণের নিকট ইহা অস্পৃশ্য। নবদ্বীপচন্দ্রকে আমরা হারাইয়াছি, কে জানে ঠাকুরের ত্যাগবৈরাগ্য-প্রদীপ্ত নিষ্কলুষ

জীবনচরিত্র ধীরে-ধীরে বিস্মৃতির তলে না ডুবিয়া যায়! যে সম্পদ্ মানুষের জীবনগঠনের অনিবার্য্য স্তররূপে প্রমাণিত না হয়, সে সম্পদ্ লোভনীয় হইলেও, দুর্ব্বোধ্য ও দুষ্প্রাপ্য বোধে ভবিষ্যৎ তাহা বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হয়।

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের যে সকল হেতুর উপর নির্ভর করিয়া বৈষ্ণবকবিরা শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন, উহা অবজ্ঞার বিষয় না হইলেও, ঐগুলি যে মুখ্য কারণ নহে, তাহা আমরা জোর করিয়া বলিব।

যিনি যত বড় মহাপুরুষই হউন না, জীবদেহের যে অখণ্ডত্ব তাহা হইতে তাঁহাকে বিভাজ্য বোধে তত্ত্ব নিরূপণ করিতে চাহিলেই আমরা বিকৃত অর্থ করিয়া বসিব। চিরদিন তাহাই হইয়াছে। ভক্ত ও ভগবান্ কল্পবস্তু এবং ইহার অভিব্যক্তির মধ্যে কাব্য থাকিতে পারে, রস ও শিল্পচাতুর্য্য অবিভাজ্য বস্তুকে বিযুক্তরূপে দেখাইবার কৌশল করিতে পারে; কিন্তু সুরবৈচিত্র্যে নিখিল জীবজগতের সহিত চিরদ্বন্দ্ব ও স্বাতন্ত্র্য ইহা-দ্বারা প্রতিষ্ঠা করিলে চলিবে না।

চৈতন্যদেবের অবির্ভাব প্রসঙ্গে বৈষ্ণবকবিগণ পৌরাণিক যুগের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। পরবর্ত্তী যুগেও দেখি, একই ছন্দে সকলের কণ্ঠেই সেই পুরাতন সঙ্গীত। মৃত্যুর কষাঘাতে ব্যষ্টিজীবনের চরম অঙ্কপাত হয় বলিয়া আমাদের যে একটা অখণ্ড প্রাণ আছে, অখণ্ড দেহ আছে, এবং যুগে-যুগে সমগ্র জীবনের মধ্যে একটী সত্য আবিষ্কার করার জন্য অখণ্ড প্রাণই নানা বেশে আবির্ভূত হন, এই রহস্য উপলব্ধি করা দুঃসাধ্য হইয়াছে। জীবনের মধ্যে মৃত্যুর সংস্কার সমস্ত দৃষ্টিকে অন্ধ করিয়া দেয়, এই হেতু অখণ্ড প্রাণ হারাইয়া ক্ষুদ্রত্বের পরিতৃপ্তি লক্ষ্যস্বরূপ হইয়া উঠে। কামনার বুভুক্ষুতা যদি ঘুচে, পরমাত্মাকাঙ্ক্ষায় এই একই কামনা রাজবেশে আসিয়া দেখা

দেয়, তখন বৈরাগ্যের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া ইহা মিলে, তাহাতেও যেমন বাধে না; অন্যদিকে প্রাকৃত জীবনভোগে ক্ষুদ্র হিয়াটুকু দিয়া, যদি অব্যক্ত যাহা তাহা মিলে—অমৃতবোধে বিষকেও অঞ্জলিপূর্ণ করিয়া মুখে তুলি।

ভারতের চতুর্ব্বিধ আশ্রমগঠনের মূলও ব্যক্তিত্বের মুক্তিকামনা। পশুত্বের বলি দিতে গিয়া কঠোর ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম যখন ব্যর্থ হইল, তখনই মানুষ বিবেককে সান্ত্বনা দিয়া গৃহ গড়িয়া বসিল। সত্যকে উপেক্ষা করিয়া কে কোথায় শান্তি পাইয়াছে? জীব আবার অরণ্যবাসী হইল, কঠোর সন্ন্যাস-ব্রত ধারণ করিল, অবস্থাগুলির সমাহার করিয়া স্থিতিশীল সমাজ স্বভাবের ছন্দঃ ধরিয়াই জীবনকে ভাগ করিয়া দিল—সর্ব্ববিধ অবস্থার ভোগচরিতার্থতা হেতু; কিন্তু সত্যের গতি রুদ্ধ হইবে কেন? জীবনের চরম পরিণতি যদি হয় সন্ন্যাস, কি কারণ প্রকৃতিকে অনর্থক বিনাইয়া ভোগ দেওয়া? শঙ্করের জয়ডঙ্কা চতুরাশ্রমের সীমা ভাঙ্গিয়া দিল। এই যে খণ্ডত্বের, ব্যক্তিত্বের সুদৃঢ় সংস্কার স্বর্গের অমৃতকেও কলুষিত করিতেছে; কামনা-ভ্রান্ত চিত্ত যদি একান্ত অনুরক্ত হইল কোন বস্তুতে, তবে সেই বস্তুকে জগৎ হইতে পৃথক্ না করিতে পারিলে যেন তৃপ্তি নাই—ইহা অকারণ নহে! কামনার পূর্ত্তি হইলেই ইহা নিঃশেষ হয় না; কিন্তু বিনা পূর্ত্তিতে যদি কোথাও রূপান্তর হওয়ার সম্ভাবনা হয়, তবে তাহার মহিমা-জ্ঞান ক্ষুণ্ণ যাহাতে না হয়, তাহার জন্য খুবই সতর্ক থাকিতে হয়। কেন-না, ইহার উপরেই হৃদয়ের স্বর্গীয় বৃত্তি—শ্রদ্ধা, বীর্য্য, রুচি, রস, রতি। পরিণামে যাহা অমৃতে পরিণত হয়, তাহার আশ্রয়তত্ত্বকে যদি চিন্ময় তত্ত্বরূপে না দেখা যায়, তাহা হইলে অসংখ্য দ্বন্দ্বসমন্বিত চিত্তবৃত্তি দুর্নিবার সংশয়-সাগর উত্তীর্ণ হইয়া কোন মতে কোন জাগতিক বস্তুতে দৃঢ়নিষ্ঠ হইতে

পারে না। কাজেই দেহধারী জীবকে লক্ষ্য করিয়াই সাধককে বলিতে হয় :

"সেই নারায়ণ কৃষ্ণের স্বরূপ অভেদ।
একই বিগ্রহ কিন্তু আকার-বিভেদ॥
ইহোঁত দ্বিভুজ, তিহোঁ ধরে চারিহাত।
ইহোঁ বেণু ধরে, তিহোঁ চক্রাদিক সাথ॥"

অথবা আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইলে বলিতে হয় :

"চৈতন্য গোঁসাঞি এই তত্ত্বনিরূপণ।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন॥"

এইরূপ আপনা হইতে ইষ্টকে ঊর্দ্ধে স্থাপন করা হইলে, ইষ্টমূর্ত্তির আবির্ভাব-হেতুনিরূপণ কল্পনা করিয়াই করিতে হয়। শ্রীচৈতন্যদেবের আগমনের যে হেতু, তাহা যদি প্রত্যেক জীবের হয়, তাহা হইলে ইষ্টের প্রতি মহিমা-বোধ তিরোহিত হয়, ভক্তি লোপ পাওয়াও অসম্ভব নহে। এই ভয়েই ভক্ত তাঁর ইষ্টের ছবি আঁকিতে গিয়া যত রঙ্ ঢালিয়াছেন, তাহাতে ভবিষ্যতে আর যে কেহ তাঁহাকে অবিকৃত ভাবে চিনিবে, আশ্রয় পাইবার জন্য বাহু বাড়াইবে, তাহার আর উপায় থাকে না।

সকল মানুষের অবতরণের হেতু যাহা, অবতার মহাপুরুষগণের তাহা হইতে ভিন্ন হেতু নহে ; সকল জীবের আচার-আচরণ যে হেতু-মূল লইয়া, অবতারপুরুষগণের কর্ম্ম ও ব্যবহার তাহা হইতে পৃথক্ নহে। এই সহজ ভিত্তির উপর আমরা ভারতের মহাপুরুষগণের জীবনচরিত্র আলোচনা করার পক্ষপাতী ; ইহাতে যুগাবতারগণের প্রতি শ্রদ্ধা হ্রাস না হইয়া, বরং আশা ও উৎসাহ পাই। আমরা এইজন্য ঠাকুরের রসমার্গের কারণ দেখাইবার ছলে এত কথার অবতারণা করিলাম। একটি কার্য্যকারণ যদি মুখ্যতঃ নির্ণয় করা সুসাধ্য হয়,

তবে সেই কৌশলে অসংখ্য মহাত্মাগণের জন্ম-কর্ম্ম-সাধনার সকল রহস্য স্পষ্ট দিবালোকের মত প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

গৌণ কারণ প্রত্যেক্যের জীবন আলোচনা করিয়া অসংখ্য প্রকারে চিত্রিত করা যায়; কিন্তু প্রত্যেক সৃষ্ট রূপের মূল কারণ একটি ভিন্ন দ্বিতীয় নহে। ঈশ্বরের ইচ্ছা যেখানে প্রকট ভাবে মূর্ত্ত, সেইখানেই অখণ্ড জীবনের, অখণ্ড দেহের পরিণাম-বোধ স্পষ্ট হইয়া উঠে। তাই যে কোন দেশে, যে কোন জাতির মধ্যে ভাগবত ইচ্ছার অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ মূর্ত্তি প্রকাশিত হইলে সমগ্র জগতে তাহার দ্যোতনা প্রকাশ পায়। সৃষ্ট বস্তুর প্রত্যেকের সহিত প্রত্যেকটির অবিভাজ্য সম্বন্ধই ইহার কারণ।

জীব ও ঈশ্বর ভিন্ন নহে। বিশেষ, যে ভারতে অদ্বৈত বেদান্ততত্ত্ব ধর্ম্মকেন্দ্ররূপে স্বীকৃত, সেখানে ভগবান্ হইতে কোন বস্তুকে পৃথক্ দেখা পাপ। ভগবানের সহিত সৃষ্টির নিত্যযোগের সুপ্ত চেতনার জাগরণ যে মায়ার আবরণে সম্ভবপর হয় না, তাহা বিদীর্ণ করার পুরুষার্থ যে আধারে প্রকাশ পাইয়াছে, সেইখানেই ভগবানের নিগূঢ় ইচ্ছার মূর্ত্তি বিগ্রহান্বিত হইয়াছে। তোমার-আমার আধারে ইহা তেমন প্রকট নহে. তাহার কারণ লইয়া আলোচনা অজ্ঞতা; কেন-না, দেহের ভিন্নতাবোধ সৃষ্টির ছন্দঃ, স্বরূপতঃ যে কোন ক্ষেত্রেই ইহা সুসিদ্ধ হউক না—ছন্দানুক্রমে ইহা সর্ব্বক্ষেত্রে সঞ্চারিত হইবেই। দৃষ্টির বাহিরে যে রূপ, সেখানে জড় চক্ষুঃ প্রতিহত হইলেও, একটা অখণ্ড দেহচেতনার মধ্যেই জীবরূপের সহিত অরূপের যোগ সিদ্ধ হওয়ার সাধনা চলিয়াছে।

যাহা তোমার-আমার মধ্যে ইচ্ছা-বৈচিত্র্যে পরস্পরে দ্বন্দ্ব, তাহা মূলের সহিত যুক্তি পাইলেই বিরাট্ পুরুষার্থরূপে প্রকট হইবে। অন্তরায় আমাদের জড়ত্ব।

ঈশ্বরের বিরাট্ ইচ্ছা—যে যন্ত্রে বিশুদ্ধ সুরে সঙ্গীত রচনা করিবে, সে যন্ত্রের শোধন নানা ভঙ্গীতে অনন্তযুগ নিরবচ্ছিন্ন অখণ্ড প্রাণ ও দেহের উপর দিয়া সাধিত হইয়াছে। এই হেতু "যে রাম, যে কৃষ্ণ, সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ", এই কথা শুনিয়া যাঁহারা বিচলিত হন, তাঁহাদের এই অনন্ত অখণ্ড অনুভূতি চেতনায় জাগ্রৎ নহে, ইহাই বুঝিতে হইবে এবং অপরে ইহা বলিলে আপত্তির কথা নাই; কিন্তু দেখিতে হইবে—কল্পনার সহিত এই অনুভূতি কতখানি জীবনে বস্তুতন্ত্র হইয়া উঠিয়াছে।

দেহ-চেতনার সবখানি ঈশ্বর-চেতনায় তুলিয়া দেওয়ার সাধনাই ভারতের যোগতত্ত্ব। কেবল অন্তঃকরণের লয়েই দেহের প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঈশ্বরযুক্তি পায় না। তাহার জন্যও বিশিষ্ট সাধনপ্রথা আছে, তন্ত্র ও সহজিয়ার মধ্যে ইহার সঙ্কেত পাওয়া যায়।

দেহ-চেতনার কোন অংশ ঈশ্বর হইতে ভিন্ন বোধ থাকিতে ভাগবত জীবনের পূর্ণত্ব সাধিত হয় না। ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মানুভূতি তুরীয় চেতনা দিয়া লাভ হইলেও, জাগ্রৎ জীবন পশুত্বের সংস্কার হইতে মুক্ত হয় না, সেখানে সতর্ক হইয়াই আত্মরক্ষা করিতে হয়। জীবনে পূর্ণ ভাগবত-তত্ত্ব অধিষ্ঠিত হইলে, এইরূপ সতর্কতার প্রয়োজন কি? স্বভাব যদি দিব্য হয়, তবে জীবনের সকল আচরণের মধ্যেই দিব্যত্বের খেলা স্বচ্ছন্দভাবেই লীলায়িত হইবে। উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব ও যোগ-শাস্ত্রাদির আত্মতত্ত্বে ভারতের সাধনা পূর্ণ সাফল্য না পাইয়াই তন্ত্র ও সহজিয়া সাধনার আবিষ্কার করিয়াছিল।

ঠাকুর তন্ত্রসাধনায় দিব্য প্রাণের পরিচয় পাওয়ার সঙ্কেত আছে, ইহা বুঝিয়াছিলেন। রসতত্ত্বের সাধনায় পাঞ্চভৌতিক দেহচেতনাকে শোধিত করার জন্যই ইহাতে ঝাঁপ দিয়াছিলেন; কেন-না, সামান্য

দেহীর মৃত্যু হয়; বিশেষ দেহী যাহা, তাহার বিনাশ নাই। যাহা নিত্য, তাহা সিদ্ধরূপে পাওয়ার প্রেরণা সৃষ্টির যে মূল তত্ত্ব, সে তত্ত্বের সাধনা স্বয়ং ভগবানই আচরণ করেন। তাই যে সকল বিশেষ ক্ষেত্রে ইহা প্রকট হয়, তাহাই ভগবানের অবতার বলিয়া আমরা পূজা করি।

দেহী তুরীয় চেতনার স্তরে আপনার মধ্যে ঈশ্বর-যুক্তি যে ভাবে উপলব্ধি করে, শোণিত-বিন্দুর মধ্যে সেই ভাবে ভগবান্‌কে জাগ্রৎ দেখার সম্ভব নয়। ভগবান্ স্বয়ং বিকৃত হইয়া লীলা-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন, এই অখণ্ড চেতনায় যদি আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সতত জাগ্রৎ হইয়া উঠে, তবেই জীবনের সকল কর্ম্মে ঈশ্বরলীলা সার্থক হয় এবং এইরূপে মর্ত্ত্যজীবন সার্থক হইলে, সৃষ্টি দিব্য ও অমৃতময় হয়। কৃতযুগ-স্থাপনের জন্যই তো তাঁর অবতরণ। এই সত্য আবিষ্কার করিতে দেয় না; শুধু যে পাপ তাহা নহে, পুণ্যের আবরণও এই পথে কম বিঘ্ন নহে; তাই সর্ব্বধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া জীবন সিদ্ধ করার দুঃসাহস মহাপুরুষদের জীবনেই লক্ষিত হয়।

ঠাকুর তাই প্রকৃতি হইয়াছিলেন। পুরুষের ছায়া লইয়া আমাদের খেলা, কায়া পাওয়ার উপায় কি?

"পুরুষ ছাড়িয়া প্রকৃতি হবে।
এক দেহ হ'য়ে নিত্যেতে যাবে॥"

বেদ মন্ত্রের মতই স্পষ্ট, বেদ মন্ত্রের মতই অভ্রান্ত এই সহজিয়ার ঋক্। কামকে উড়াইয়া দেওয়া ইন্দ্রিয় বিকৃত করা; কাম যে সৃষ্টির বীজ, সে বীজ, সে কামের রূপান্তর—যাঁহার কাম, তাঁহাতে ইহার তর্পণে সিদ্ধ হয়। কঠোর সাধনা বটে; কিন্তু জীবদেহকে ভাগবত দেহে পরিণত করার স্বপ্ন তো শুধু স্বপ্ন নহে, ইহা যে করিতেই হইবে, নতুবা এই অখণ্ড সৃষ্টি-তত্ত্বের মুক্তি আসিবে কেন?

রসতত্ত্বে তাই ঠাকুরের অবগাহন। খণ্ডিত পুরুষবোধের লয় হেতু তিনি যাহা করিয়াছিলেন, তাহা একে-একে দেখাইব। সাধনার মুখ্য কারণ সম্বন্ধে উদাসীন বলিয়া, আমরা ধরায় স্বর্গরচনার যে অখণ্ড সাধনা-স্রোতঃ অনাহত ধারায় বহিয়া চলিয়াছে, তাহার যথার্থ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। উর্ব্বর মস্তিষ্ক চাহে সুনাম, চাহে বিঘ্নহীন সুগম পথ; কাজেই জীবের মুক্তি বিধান করিতে গিয়া জীবনই বিসর্জ্জন দিই।

* *
*

॥ ৯ ॥

ঠাকুরের কিশোর জীবনে প্রকৃতি-ভাবের আধিক্য লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ায়, ভবিষ্যতে রাগমার্গে তাঁহার স্বভাব-অনুরাগ সূচিত করে না। এইরূপ রমণীসুলভ আচরণ সংসারক্ষেত্রে আদৌ বিরল নহে। ঠাকুরের জীবনচরিত্র অনিন্দ্য দিব্য আকার ধারণ করায়, তাঁর জীবনের প্রত্যেক খুঁটিনাটী ঘটনার সহিত ভবিষ্যতের সাধনজীবন যুক্ত হইয় সবখানিই রহস্যময় করিয়া তুলিয়াছে। পল্লীরমণীদের মধ্যে যে সকল কিশোর-বয়স্ক বালক বাস করে, তাহারা নারী-চরিত্রের নিত্য অভিনয় করে; রমণীগণের মনে হর্ষোৎপাদনের জন্য অনেক তরুণ যুবককেও আমরা নারী-সজ্জায় সজ্জিত হইতে দেখি; রমণীর ন্যায় বেশভূষা করিয়া, বাংলার পল্লীক্ষেত্র কেন, সহরের মার্জ্জিত সভ্য-সমাজেও নানারূপ রহস্যসৃষ্টির ব্যবস্থা আছে। সুতরাং বাল্যকালে ঠাকুরের এইরূপ আচরণ খুবই স্বাভাবিক। তিনি দুর্গাদাস পাইনের চক্ষে ধূলা দিয়া, রমণীর বেশে তাঁহার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন; অথবা কলসী-কক্ষে রমণীগণের সহিত পুষ্করিণী হইতে জল আনয়ন করিতেন। এই সকল পল্লীস্বভাবের অভিব্যক্তি ভিন্ন অন্য কিছু নহে। ইহা হইতে রাগসাধনায় তাঁর যে অলৌকিক সিদ্ধি, তাহার কোনই নিদর্শন মিলে না। ইহা নিছক স্বভাবের রঙ্গ বলিয়া আমরা ছাড়িয়া দিতে পারি।

কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে আগমন করার পর হইতে তাঁর জীবনে যে সব পরিবর্ত্তন দেখা দিল, তাহা স্বভাবের ইঙ্গিত নহে; বরং স্বভাবজয়ের

অভিযান বলা যাইতে পারে। তিনি এইখানে আসিয়া যুক্তির পথ ধরিলেন এবং তাহার পর হইতে একদিনের জন্যও তাঁহাকে প্রাকৃত জীবনক্ষেত্রে রহস্যচ্ছলেও পা ফেলিতে দেখা যায় নাই। এইরূপ তীব্র সংবেগ অসাধারণ জীবন ভিন্ন অন্য কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। এইজন্যই ঠাকুর রামকৃষ্ণকে অবতার মহাপুরুষের থাকে উঠাইয়াও সত্যানুরাগীর তৃপ্তি হয় না—শ্রীকৃষ্ণ, চৈতন্য প্রভৃতির ন্যায় অবতারীর আসন দিয়া নিত্যপূজার আকুলতা জাগে।

রাগসাধনার গোড়ার কথা—বাংলার কবি সহজ ভাবেই ব্যক্ত করিয়াছেন :

"ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রদল পদ্মে রূপের আশ্রয়।
ইষ্টে অধিষ্ঠাতা তার স্বরূপলক্ষণ হয়॥
সেই ইষ্টে যাহার হয় গাঢ় অনুরাগ।
সেইজন লোকধর্ম্মাদি সব করে ত্যাগ॥
কায়মনোবাক্যে করে গুরুর সাধন।
সেই সে কারণে উপজয়ে প্রেমধন॥
তাতে যদি কোন বাধা মনে উপজিবে।
চণ্ডীদাস বলে সে নরকে ডুবিবে॥"

বেদের কথা নহে, উপনিষদ্‌, গীতার কথা নহে ; কিন্তু বাঙালী কেবল দার্শনিকতার হিরণ্যগর্ভ কল্পনার ক্ষেত্রে বিচরণ করে নাই, তত্ত্বকে জীবনগত করার দুর্জ্জয় তপস্যা করিয়াছে। ইহা সেই জ্বলন্ত তপস্যারই অনুভূতিময়ী বাণী। ঠাকুর এই রূপকে আশ্রয় করিয়া, এই ইষ্টরূপে স্বরূপলক্ষণ ধরিয়া, জীবনের সব কিছু বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন ; লোকনিন্দা ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। বেদবিধি তাঁহার অনুসরণ করিয়াছে ; তিনি অন্য কিছুর দিকে দৃষ্টি দিতে গিয়া কোথাও

সামঞ্জস্যের দায়ে ভাবের ঘরে চুরি করেন নাই। তিনি কায়মনোবাক্য দিয়াই ইষ্টের আরাধনা করিয়াছেন। এইজন্যই রাগসাধনার যে সর্ব্বপ্রধান পরমপুরুষার্থ প্রেমরত্ন, তাহা তিনি লাভ করিয়াছিলেন। জীবনের কোন অবস্থায় সে পথে বাধা বলিয়া কোন কিছুকেই তিনি দেখিতেন না। তাঁর জয়কণ্ঠের এই বাণীতে বিষয়ীর এখনও হৃৎকম্প হয়—"ঈশ্বর বস্তু আর সব অবস্তু।" ইষ্টের অনুরাগে তিনি যে সর্ব্বত্যাগী—তাঁর বৈরাগ্যের আগুন যে অব্যর্থ সঙ্কেতে সাধনার রাজপথ নির্দ্দেশ করে! কায়মনোবাক্যের যুক্তি রাখা দায় বলিয়াই তো আমরা ঋজু ভাগবত পন্থা তির্য্যক্ জটিল করিয়া দেখি। রাগের নির্য্যাস তিনি আকণ্ঠ পান করিয়াছিলেন।

"পঞ্চরস আদি একত্র মেলি,
যে যার স্বভাব আনন্দে কেলি।"

ইষ্টের আবির্ভাবে তাঁর দিব্যস্বভাবানুযায়ী তিনি স্বচ্ছন্দ মূর্ত্তিতেই রাগসিদ্ধির মূর্ত্ত বিগ্রহ হইয়াছিলেন।

রাগসাধনার লক্ষ্য—প্রেম। যুগ-যুগান্তর ভারতের সাধনা আবর্ত্ত ভেদ করিয়া বাংলায় সিদ্ধরূপ প্রকাশ করিয়াছে। শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস যখন মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণের নিকট দুর্ব্বোধ্য, বরং অনাচার বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল; তখন তাঁর অপূর্ব্ব বেদান্তব্যাখ্যা শুনিয়া ভারতের প্রধান তীর্থ কাশীর সন্ন্যাসিমণ্ডলীও চমৎকৃত হইয়াছিলেন। মায়াবাদের খণ্ড দৃষ্টি বিদীর্ণ করিয়া বাংলার সন্ন্যাসী যেদিন জগতের ধর্ম্ম যোগকে পুরোভাগে ধরিলেন, তখন কেহ তাহা অস্বীকার করিতে পারে নাই। সৎ'এর অনুসরণ করিতে গিয়াই তো জীব নেতি-মূলক প্রবৃত্তির দায়ে পীড়িত, সৎ'এর অবিভাজ্যরূপ যে চিৎ তাহা যে অপরিত্যজ্য—সুতরাং সৎ-চিৎ'এর যুক্তিতেই রসসৃষ্টি, এবং সে রস

দিব্য ও আনন্দময়। এই যুক্তির দায়েই নিমাই গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী, রামকৃষ্ণ আত্মহারা, উন্মাদ। জীবের সহিত ভগবানের নিত্যসম্বন্ধই যোগের সিদ্ধি। তাহার জন্য প্রেম রসায়ন। বৈষ্ণবশাস্ত্রে ইহার প্রয়োজন, তাই আকুল কণ্ঠে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

প্রেমের সাধনা আছে। সে সাধনা—প্রেমে নিজের অস্তিত্ব দ্রব করিয়া দেওয়া। চিরদিন ইহা কল্পনার ক্ষেত্রেই পাক খাইতেছিল, প্রেম হওয়ার ক্রিয়াযোগ কেহ আবিষ্কার করে নাই। বাংলা বুঝি জগতের বৃন্দাবন, ব্রজধাম ; এইখানেই সে বস্তু তাই জীবন দিয়া সিদ্ধ করার অব্যর্থ সাধনা প্রকট হইয়াছে।

রাগসাধনা পঞ্চরসাত্মক। ঠাকুর শান্ত, সখ্য ও দাস্যরসের সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন। কৃষ্ণসখা শ্রীদাম, সুবলাদি ব্রজবালকদিগের ভাব লইয়া তিনি দীর্ঘদিন সাধনা করিয়াছিলেন। দাস্যভাবের সাধনায় মহাবীরের চরিত্র অনুকরণ করিয়া তিনি বৃক্ষে-বৃক্ষে 'জয় রাম, জয় রাম' শব্দে আকাশে প্রতিধ্বনি তুলিতেন। ভাব-সাধনায় তাঁর লজ্জা ছিল না ; যাহা করিতেন, সবখানি তাহাতেই ডুবাইয়া দিতেন। এইজন্য সাধনার প্রকৃত রহস্য তিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু সকল রসের সার যে মাধুর্য্য, তাহা উপলব্ধি করার জন্য ঠাকুরের অসাধারণ তপস্যা তুলনাহীন। নিজে পুরুষ হইয়া, রমণীবেশ ধারণ পূর্ব্বক তিনি শ্রীশ্রীজগন্মাতার সখীরূপে চামর হস্তে দেববিগ্রহকে ব্যজন করিতেন, কাহারও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া রমণীবেশেই তিনি মথুরবাবুর কলিকাতার বাড়ীতে প্রতিমা দর্শন করিতে যাইতেন, পুরস্ত্রীগণের সঙ্গে অবাধে মিশিতেন, নিজেকে পুরুষ বলিয়া তাঁহার জ্ঞান থাকিত না। তাঁহার এই অকপট প্রকৃতি-ভাব-সাধনায় মুগ্ধ হইয়া মথুরবাবু এইকালে তাঁহাকে রমণীজনোচিত

বহুমূল্য বস্ত্র ও অলঙ্কার প্রদান করিয়াছিলেন। ঠাকুর নির্ব্বিকার চিত্তে বসনভূষণে রমণীবেশে সজ্জিত হইয়া জগদম্বার সেবা করিতেন; ইষ্টের নিকট নৃত্য-গীত করিয়া অন্তরে অশেষ তৃপ্তি অনুভব করিতেন। এই ভাব কিরূপ প্রবল মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল, তাহা স্বর্গত সারদানন্দ মহারাজ লিখিত "লীলাপ্রসঙ্গ" হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলেই বুঝা যাইবে। (পৃঃ ২৭৯ সাধকভাব, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ)

"মধুরভাবসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া, ঠাকুর স্ত্রীজনোচিত বেশভূষা-ধারণের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, এবং পরমভক্ত মথুরামোহন তাঁহার ঐরূপ অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া, কখন বহুমূল্য বারাণসী শাড়ী এবং কখন ঘাগরা, ওড়না, কাঁচুলি প্রভৃতির দ্বারা তাঁহাকে সজ্জিত করিয়া সুখী হইয়াছিলেন···চাঁচর কেশপাশ (পরচুলা) এবং এক সেট স্বর্ণালঙ্কারেও তাঁহাকে ভূষিত করিয়াছিলেন।"

"এইরূপ রমণীবেশে থাকিয়া ঠাকুর প্রেমৈক্যলোলুপা ব্রজরমণীর ভাবে ক্রমে এতদূর মগ্ন হইয়াছিলেন যে; তাঁহার পুরুষবোধ এককালে অন্তর্হিত হইয়া, প্রতি চিন্তা, চেষ্টা ও বাক্য রমণীর ন্যায় হইয়া গিয়াছিল।"

"শ্রীযুক্ত মথুরবাবুর কন্যাগণের মধ্যে কাহার স্বামী ঐ কালে জানবাজার ভবনে উপস্থিত হইলে, তিনি ঐ কন্যার কেশবিন্যাস ও বেশভূষাদি নিজ হস্তে সম্পাদনপূর্ব্বক, স্বামীর চিত্তরঞ্জনের নানা উপায় তাহাকে শিক্ষা প্রদান করিয়া সখীর ন্যায় তাহার হস্ত ধারণ করিয়া লইয়া যাইয়া স্বামীর পার্শ্বে দিয়া আসিতেন।"

আর একটু উদ্ধৃত করিলেই এই ভাবসাধনার চরম কথা বুঝা যাইবে। "স্বপ্নে বা ভ্রমেও কখন আপনাকে পুরুষ বলিয়া ভাবিতে পারিতেন না এবং স্ত্রী-শরীরের ন্যায় কার্য্যকলাপে তাঁহার শরীর ও

ইন্দ্রিয় স্বতঃই প্রবৃত্ত হইত !…স্বাধিষ্ঠান-চক্রের অবস্থানপ্রদেশের রোমকূপ হইতে তাঁহার এইকালে প্রতিমাসে নিয়মিত সময়ে বিন্দু-বিন্দু শোণিতনির্গমন হইত, এবং স্ত্রী-শরীরের ন্যায় প্রতিবারেই উপর্য্যুপরি দিবসত্রয় ঐরূপ থাকিত।"

ইহা কল্পনা নহে। কেন-না, ঠাকুরের ভাগিনেয় বলেন—তিনি উহা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন এবং পরিহিত বস্ত্র দুষ্ট হইবার আশঙ্কায় ঠাকুরকে উহার জন্য এইকালে কৌপীন ব্যবহার করিতেও দেখিয়াছেন।" (পৃঃ ২৮৭ সাধকভাব, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ)

এই সম্বন্ধে আর অধিক কথা নিষ্প্রয়োজন। এক্ষণে ভবিষ্য বাঙ্গালীকে অব্যর্থভাবে এই রহস্যের মূল কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে।

সাধনার লক্ষ্য যেখানে লয়, মোক্ষ, সেখানে এইসব সাধনার রীতি পরিত্যজ্য ; কেন-না, জাগ্রৎ চেতনার এইরূপ বিচিত্র অনুশীলন মায়াবাদীর নিকট নিরর্থক। ঠাকুর বাংলার সাধনাকে রূপ দিয়াছেন। বাঙ্গালীর সাধনা সম্বন্ধে আমাদের অস্পষ্টতা থাকায়, ধর্ম্মক্ষেত্রে বায়ুপ্রবাহে শুষ্ক তৃণের মত আমরা উড়িয়া বেড়াই। আমাদের মনে রাখিতে হইবে—ভারতের মায়াবাদ যে ভাবে ব্রহ্মৈক্য লাভ করিতে গিয়া আপনাকে লয় করিয়াছে, বাঙ্গালী তাহা হইতে স্বতন্ত্র ভাবে জীবনের শাশ্বত তত্ত্বের আবিষ্কার করিতে উদ্যত হইয়াছিল এবং সে পথে সাফল্যের জয়ও দিয়াছে।

"সার্ষ্টি সারূপ্য আর সামীপ্য সালোক্য।
সাযুজ্য না লয় ভক্ত যাতে ব্রহ্ম-ঐক্য॥

তবে বাঙ্গালী কি চাহে ?

"যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তইমু নাম-সংকীর্ত্তন ;
চারি ভাব-ভক্তি দিয়া নাচাইমু ভুবন॥"

এই চারি ভাব—সখ্য, দাস্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য্য। বলা বাহুল্য, ইহাই সম্বন্ধ-তত্ত্ব-প্রতিষ্ঠার মুখ্য উপাদান। কাহার সহিত কাহার সম্বন্ধ? জীবের সহিত ভগবানের। জগতের সহিত ঈশ্বর-তত্ত্বের যে অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ তাহাই যদি জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত না হইল, তাহা হইলে সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। তাই বাংলার দেবতা বলিলেন:

"আপনি করিব ভক্ত-ভাব অঙ্গীকার।
আপনি আচরি' ধর্ম্ম শিখাব সবার॥

কিন্তু এই আচার সহজ নহে। জীবের সহিত ভাগবত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইলে, জীবকোটীকে ঈশ্বরকোটীর থাকে উঠিতে হয়। বাংলায় প্রায় হাজার বৎসর এই লক্ষ্যেই সাধনপ্রবাহ ছুটিয়াছে। আত্মস্থ হওয়ার অভাবে, স্বধর্ম্ম হইতে স্খলিত হইয়া, আমরা সত্যলাভে বঞ্চিত হইতেছি।

এই সম্বন্ধ ভগবানের চাওয়া—মানুষের নহে। ভগবানের চাওয়া যাহা, তাহা অবিকৃত আকারে আধারে প্রতিভাত হয় না, যদি আধার সর্ব্বসংস্কারমুক্ত না হয়। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম, এই ত্রিমার্গযোগ দেহগত সংস্কার-মুক্তির পক্ষে যথেষ্ট নহে বলিয়াই বাংলার রাগাত্মিকা সাধনার প্রবর্ত্তন। দেহগত সংস্কারক্ষয়ের জন্য কি কঠোর তপস্যা বাঙ্গালীকে করিতে হইয়াছে, তাহা আমরা বাংলার বেদবাণী উদ্ধৃত করিয়া দেখাই।

বাংলার সহজ প্রেরণায় পল্লীসাধক চণ্ডীদাস যখন আত্মবিসর্জ্জনের পথে ছুটিলেন, তখন তাঁহার প্রশ্ন হইল:

"মরিয়া দোঁহেতে কি রূপ হব!"

কে কোথায় মরিবে? পুরুষভাব প্রকৃতিতে লয় করিয়া দেওয়ার নির্দ্দেশ ইহাতে পাওয়া যায়। অন্তঃপ্রেরণা গর্জ্জিয়া উঠিল:

"...মরিয়া হইবে রজক ঝি॥
পুরুষ ছাড়িয়া প্রকৃতি হবে।
এক দেহ হয়ে নিত্যেতে যাবে॥"

বাংলার ইহাই নায়িকা-সাধন। অনেকে বেদোপনিষদের জ্ঞানে শুষ্ক পাণ্ডিত্য ও পবিত্রতার আদর্শে এমনই অন্ধ, যে নায়িকাসাধনের কথা শুনিলেই নাসিকা কুঞ্চিত করেন, অথচ অন্তরে পৃথিবীর আবর্জ্জনা দূর করার ইচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহারা নিরুপায়! এই সাধনার লক্ষণ কি?

"নায়িকাসাধন শুনহ লক্ষণ
যেরূপে সাধিতে হয়
শুষ্ক কাষ্ঠের সম আপনার
দেহ করিতে হয়।"

এই যে প্রকৃতিগত রতি, ইহাতে যে কামগন্ধ নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। কেন-না, কামের খোরাক কোথা!

"স্নান না করিব জল না ছুঁইব
এলাইয়া মাথার কেশ;
সমুদ্রে পশিব নীরে না তিতিব
নাহি সুখ-দুঃখ-ক্লেশ।
রজনীদিবসে রব পরবশে
স্বপনে রাখিব লেহা;
একত্র থাকিব নাহি পরশিব
ভাবিনী ভাবের দেহা॥"

এই নিছক ভাব-সাধনায় ঠাকুর কিরূপ উন্মাদ ও তন্ময় হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার আচরণ আজও যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়া জীবিত আছেন, তাঁহারা শতকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। এই প্রকৃতিসিদ্ধ

জন যে সূতায় সুমেরু-শিখর গাঁথে, মাকড়সার জালে মাতঙ্গ বাঁধিয়া রাখে! তুচ্ছ কাম এখানে স্পর্শ দেয় না। রবির কিরণ যেমন জলকে বাষ্প করিয়া উপরে উঠাইয়া লয়, ইহাও তদ্রূপ।

"অন্তরে-অন্তরে শুষ্ক করি' তারে
আকর্ষয়ে উর্দ্ধভাগে।"

"লীলাপ্রসঙ্গে" এই সাধনার লক্ষ্য সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহার উপর আর কথা নাই :

"মানব মনের অন্য সকল সংস্কারের অবলম্বনস্বরূপ 'আমি দেহী' বলিয়া বোধ এবং তদ্দেহ-সংযোগে 'আমি পুরুষ বা স্ত্রী' বলিয়া সংস্কারই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। শ্রীভগবানে পতি-ভাবারোপ করিয়া "আমি স্ত্রী" বলিয়া ভাবিতে-ভাবিতে সাধক পুরুষ আপনার পুংস্ত্ব ভুলিতে সক্ষম হইলে, তিনি যে উহার পরে "আমি স্ত্রী", এ ভাবকেও অতি সহজে নিক্ষেপ করিয়া ভাবাতীত অবস্থায় উপনীত হইবেন, ইহা বলা বাহুল্য।"

বাংলার সাধনায় চণ্ডীদাস হইতে জীবন সিদ্ধ করার নীতি কোথায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে, তাহা মর্ম্ম দিয়া অনুভব করার বিষয়। আমরা চাহি ভাগবত জীবন; কিন্তু জীবন সংস্কার-দুষ্ট থাকিতে ভগবানের অমোঘ ইচ্ছা লীলায়িত হয় না। নৈতিক বা আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ইহার জন্য যথেষ্ট নহে। চাই দেহগত সংস্কারের লয়। দেহীর স্ত্রীত্ব ও পুংস্ত্ব এই দুই বোধ তিরোহিত হওয়ার পর যে ভাবাতীত অবস্থা, তাহার উপর ভর দিয়া ঈশ্বরের মূর্ত্ত প্রকাশ সম্ভবপর হয়। এই অবস্থায় কুণ্ঠা বা কৃচ্ছ্রতা থাকে না। যাহা তিনি চাহেন, তাহাই হয়; যাহা তিনি চাহেন না, তাহা হয় না। আদর্শের পীড়ন এই সিদ্ধ দেহে কার্য্যকরী নয়, ভাগবত বিধানই এইখানে

জয়-শ্রী লইয়া ফুটিয়া উঠে। বিশুদ্ধ আধারগঠনের জন্য তাই এই দেহে দেহান্তর-সাধনার অপূর্ব্ব তত্ত্ব বাংলার তীর্থেই মিলে। ঠাকুরের দাম্পত্যজীবনের পরিণতি যাহা, তাহা এই সিদ্ধ আধারে ইষ্টের ইচ্ছায় সিদ্ধ হইয়াছে। আমরা ধীরে-ধীরে ঠাকুর জাতিকে কোন পথের নির্দ্দেশ দিয়াছেন, তাহা তাঁহার জীবনচ্ছন্দঃ ধরিয়াই বুঝিব।

* *
*

॥ ১০ ॥

তারপর, বেদান্তসাধনার কথা। সাধনা চেষ্টা করিয়া হয় না, অন্যের অধ্যাত্মজীবনবিকাশ দেখিয়া কেহ যদি তাহার জন্য মুখে রক্ত উঠায়, তবুও ইহা মিলে না। ঠাকুরের জীবন দিয়া ইহাও সপ্রমাণ হইয়াছে। তদীয় ভাগিনেয় হৃদয় ঠাকুরের দিব্যজীবনের প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া, পত্নীবিয়োগের পর, তাঁহার মত অধ্যাত্মভাবরাজ্যে আরোহণ করার চেষ্টা করেন। ঠাকুর বলিতেন "ঐ সব তোমার হইবে না, আমার সেবা করাই তোমার কাজ"; কিন্তু তাহা তিনি সহজে শুনেন নাই। মথুরবাবু হৃদয়ের বিভোরতা দেখিয়া ঠাকুরকে বলিতেন —"হৃদয়ের আবার এ কি ভাব?" পাছে হৃদয়কে ভণ্ড বলিয়া তাঁহার ধারণা হয়, এইজন্য ঠাকুর তাহা সামলাইয়া বলিতেন "হৃদয় একটু ভাব চাহে, মা দিয়াছেন, উহা ছল নয়। কিন্তু টিঁকিবে না।" সত্য-সত্যই হৃদয়কে সাধনার পথ হইতে ফিরিতে হইয়াছিল, দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করিয়া তিনি আবার সংসার পাতিয়াছিলেন। জগতের অন্য সকল সামগ্রী পুরুষকার দিয়া আয়ত্ত করা যায়, অধ্যাত্মজীবনের জন্য যে সংবেগ তাহা মানুষের জন্মগত অধিকার। সে অধিকার ঠাকুরের ছিল, তাই তিনি সহজ-সাধনায় সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইয়া, ইহার পরবর্ত্তী যে অনিবার্য্য সাধন-স্তর, তাহার উপর আসিয়া দাঁড়াইলেন।

বেদান্তসাধনার বিস্তৃত বিবরণ দিয়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করিব না; তবে ঠাকুরের সিদ্ধ জীবনের জন্য যে কারণ বেদান্তসাধনার প্রয়োজন, তাহা সংক্ষেপে বলিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব।

স্বামী সারদানন্দের উক্তিটুকুই এই ক্ষেত্রে যথেষ্ট হইবে বলিয়া, আমরা তাহাই উদ্ধৃত করিলাম—"ভাব ও ভাবাতীত অদ্বৈতরাজ্যের ভূমানন্দই সীমাবদ্ধ হইয়া ভাবরাজ্যের দর্শন-স্পর্শনাদি সম্ভোগানন্দরূপে প্রকাশিত রহিয়াছে। অতএব মধুরভাবে পরাকাষ্ঠালাভে ভাবরাজ্যের চরম ভূমিতে উপনীত হইবার পরে, ভাবাতীত অদ্বৈতভূমি ভিন্ন অন্য কোথায় আর তাঁর মন অগ্রসর হইবে ?"

স্বামীজির "লীলাপ্রসঙ্গে" ঠাকুরের এই বেদান্তসাধনার পথে অগ্রসর হওয়ার মূলে তাঁর নিজের আকাঙ্ক্ষা তিল মাত্র ছিল না, ইহা সুস্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। সর্ব্বসাধনার গোড়ার কথা—"আত্মসমর্পণ" ! ইহা ঠাকুরের প্রতিদিনের সহজ জীবন-যাত্রার মধ্যেও যেমন, উচ্চ সাধন-তত্ত্বে ব্রতী হওয়ার পথেও সেইরূপ দেখা গিয়াছে। ঠাকুর কালীবাড়ীর চাঁদনীতে অন্য সাধারণ লোকের ন্যায় বসিয়াছিলেন, সহসা সেখানে উলঙ্গ সন্ন্যাসীমূর্ত্তি আসিয়া উপস্থিত হইল। ইনিই বেদান্তগুরু তোতাপুরী, তীর্থদর্শনচ্ছলে তিনি বাংলায় আসিয়াছিলেন। ঠাকুরের মুখকান্তি ও জ্যোতির্ম্ময় দৃষ্টি দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন, ঠাকুরকে বেদান্তসাধনায় ব্রতী হওয়ার জন্য ধরিলেন। ঠাকুর নির্ব্বিকার চিত্তে তাঁর কথার উত্তরে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আত্মসমর্পণ-সিদ্ধ যোগ-জীবনেরই পরিচয়—"কি করিব না করিব, আমি কিছুই জানি না, আমার মা সব জানেন, তিনি আদেশ করিলে করিব।"

তোতাপুরী তখন ভাবিতে পারেন নাই যে, এই মা সামান্য দেহধারিণী জননীমূর্ত্তি নহেন ; বিশ্বজননীকে মাতৃসিদ্ধ ঠাকুর ভক্তির ছাঁচে ফেলিয়া মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে গড়িয়া তুলিয়াছেন। ইহা যেদিন তিনি জানিলেন, সেদিনও তিনি ভক্তির

মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হন নাই; কুসংস্কার বলিয়াই তিনি ঠাকুরের সেই ভাবকে অবজ্ঞার চক্ষেই দেখিয়াছিলেন। যাহা হউক, ঠাকুর ইষ্টমূর্ত্তির নির্দ্দেশ লাভ করিয়াই, বেদান্তসাধনায় ব্রতী হইলেন।

আত্মসমর্পণ-যজ্ঞে আত্মাহুতি দিয়া যিনি ইষ্টময়, তাঁহার পুনঃ-পুনঃ বিভিন্ন সাধনপথ আশ্রয় করা কেন—এই প্রশ্নের সদুত্তর 'লীলাপ্রসঙ্গে'র ছত্রে-ছত্রে আছে। আমি অন্যদিক্ দিয়া ইহার প্রয়োজন দেখাইবার চেষ্টা করিতেছি। বেদান্তসাধনারও এইরূপ একটী গভীর উদ্দেশ্য আছে।

বেদান্ত—ভারতের চরম সাধনা। ঠাকুর ইহার সম্বন্ধে নিজেই বলিয়াছেন—"উহা শেষ কথা রে, শেষ কথা! ঈশ্বরপ্রেমের চরম পরিণতিতে সর্ব্বশেষে উহা সাধকজীবনে স্বতঃ আসিয়া উপস্থিত হয়; জানিবি, সকল মতেরই উহা শেষ কথা এবং যত মত, তত পথ।"

সাধনার পথে এমন অভ্রান্ত সান্ত্বনার বাণী এ পর্য্যন্ত কোন মহাপুরুষের কণ্ঠে ধ্বনি তুলে নাই; এই একটী কথার সম্যক্ অনুসরণ করিতে পারিলে, অসাধারণ ধৃতিলাভ হয়। সাধক উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া, শুধু মানসিক বিকৃতিই লাভ করে। স্নায়ু ও মস্তিষ্কের বিকার হইলে, অনেকেই নানারূপ অবস্থা ও দর্শনাদি পায়, ঠাকুরের অবস্থাও এইরূপ হইতে পারে—এই সংশয় বহুলোক করিয়াছে; কিন্তু তাঁর দর্শন ও অনুভূতি বাস্তবক্ষেত্রে যখন প্রত্যক্ষ রূপ লইয়া দেখা দিত, তখন তাঁহাকে সংশয় করার সাধ্য কাহারও হইত না। ঈশ্বরপ্রেম-লাভ হইলে অদ্বৈত-ভাবের সিদ্ধি স্বতঃই উপস্থিত হয়, এবং উহা বেদান্তসিদ্ধ জনেরই প্রাপ্য নহে। সকল মতেরই উহা চরম কথা—এই অকাট্য যুক্তি উপেক্ষার সামগ্রী নহে।

কিন্তু অবতার-পুরুষগণের অদ্বৈতানুভূতি তথাকথিত মায়াবাদী

সন্ন্যাসিগণ হইতে পৃথক্ ছন্দে লীলায়িত হইয়াছে, এই বিষয়টী বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করার বস্তু।

ভাব হইতে ভাবাতীত অবস্থায় পৌঁছিয়া, পুনরায় ভাবমুখে থাকার ঠাকুরের পক্ষে কি প্রকারে সম্ভব হইল, তাহা ঠাকুরের জীবনপ্রসঙ্গে সুস্পষ্ট থাকিলেও, সাধনার সংস্কারে চিত্ত আমাদের এমনই অপরিচ্ছন্ন যে, ইহা সম্পূর্ণরূপে আমাদের বোধগম্য হয় না।

ঈশ্বর-পুরুষের সবখানি জীবনই ভাগবত। সকল অবস্থাই মায়াতীত, ভাবাতীত; সকল ভাবের মধ্যেই অন্তহীন ভাব বিদ্যমান। আমার ভগবান্ অণু হইতে অণু এবং তাঁহার মহান্ ভাবেরও তুলনা নাই; তাই বলিয়া অণুর সহিত তাঁহার মহত্ত্বের যে গুণ-বৈষম্য আছে, তাহা নহে। অণুতে যে আস্বাদ, যে চেতনার স্পর্শ, মহান্ ভাবে তদতিরিক্ত অনুভূতি নাই। ঈশ্বরবস্তু সাম্যহীন নহে, তারতম্য আমাদের চিত্তের বিকৃতি।

এইজন্য বেদান্তসাধনার পর, ঠাকুর মৃত্তিকাবক্ষে শ্যাম শষ্পরাশির উপর দিয়া কেহ হাঁটিয়া গেলে, বুকে বেদনার আঘাত পাইতেন। চাঁদনীর ঘাটে মাল্লারা মারামারি করিয়া একজন পৃষ্ঠে গুরুতর আঘাত পাইলে, তিনি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিলেন; হৃদয় স্বচক্ষে ঠাকুরের পৃষ্ঠে আঘাতের রক্তবর্ণ চিহ্ন দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। ভাবের সীমা ছাড়াইলে, ভাবাতীত রাজ্যে সমতার অনুভূতি এমনই বস্তুতন্ত্র আকারেও দেখা দেয়।

লয় যেখানে সৃষ্টিকে দিব্য করে না, সেখানে লয় বিকার মাত্র। ভারতের মায়াবাদ সেইখানে ব্যর্থ, যেখানে লয়ের পর নূতন জীবন জাগে নাই। ঠাকুরের বেদান্তসাধনার পরই, দক্ষিণেশ্বরে নবযুগারম্ভ হয়; তাঁর আত্মলয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আলোচনা করিলেই ইহা বুঝা যাইবে।

ঠাকুর বিবাহিত, তাঁর জননী তখন দক্ষিণেশ্বরে বিদ্যমান; বেদান্ত-নির্দ্দিষ্ট সন্ন্যাস লওয়া তাঁর কেমন করিয়া হয়? অথচ শ্রীশ্রীজগন্মাতার বাণী তিনি কর্ণগোচর করিয়াছেন—"যাও, শিক্ষা কর, তোমাকে শিখাইবার জন্যই সন্ন্যাসী এখানে আসিয়াছেন।" ঠাকুরের উদ্দেশ্য—বেদান্তের সাধনা সমাপ্ত করা, বেদান্তের মধ্যে শিখিবার বস্তু আয়ত্ত করা। তিনি গোপনে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন—গোপন, কেন-না বৃদ্ধা জননীর প্রাণে পাছে আঘাত লাগে, ইহার জন্যই সতর্কতা।

ভারতের সন্ন্যাস চরম তপস্যা। নাম-রূপ-ভাবের সাধনা জীবনের সংস্পর্শে সংস্কার-মলিন হওয়া বিচিত্র নহে; যাহা জীবনের সত্য বীর্য্য, শাশ্বত, তাহা বুঝিয়া পাওয়ার উপায়—ত্যাগ, সন্ন্যাস। কেবল "দারাপুত্র-সম্পৎ-লোকমান্য" ত্যাগ নহে; জীবনের সত্য-মিথ্যা, ধর্ম্মা-ধর্ম্ম, উপসনামন্ত্র, জীবনের যাবতীয় কর্ম্ম হইতে মুক্তি—বেদান্তের চরম লক্ষ্য। ঠাকুর অবহিতচিত্তে শিখা-সূত্র, যজ্ঞোপবীত পবিত্র যজ্ঞকুণ্ডে আহুতি দিয়া, নাম-গোত্রবর্জ্জনপূর্ব্বক কৌপীন ধারণ করিয়া, গুরুর নিকট উপদেশ ও সাধনগ্রহণে তৎপর হইলেন।

কিন্তু শ্রীমৎ তোতাপুরী বেদান্তের বাণী উদ্ধৃত করিয়া যতই ঠাকুরের চিত্ত হইতে নামরূপের সংস্কার বিসর্জ্জন দিয়া "নিত্যশুদ্ধবুদ্ধ-মুক্তস্বভাব, দেশ-কাল-পাত্রাদি-অপরিচ্ছিন্ন" ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য তাঁহার চিত্তকে একাগ্র করিতে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, ঠাকুরের চিদাকাশে ততই তাঁর ইষ্টমূর্ত্তি চিদ্ঘনোজ্জ্বল হইয়া উদ্ভাসিত হইতে লাগিল, হৃদয় আনন্দরসে উথলিয়া উঠিল। ঠাকুর বলিলেন "প্রভু, আমার চিত্ত নামরূপের গণ্ডী ছাড়াইয়া উঠিবে না, নির্ব্বিকল্প আত্মধ্যান আমার সাধ্য নয়।"

শ্রীমৎ তোতা তখন উত্তেজিত হইয়া, একখণ্ড কাঁচ উঠাইয়া ঠাকুরের ভ্রূমধ্যে গভীরভাবে বিদ্ধ করিয়া দিলেন। দর-দর করিয়া রক্তধারা ঝরিয়া পড়িল। শ্রীমৎ তোতা সিংহগর্জ্জনে বলিলেন—"এইখানে চিত্তকে গুটাইয়া ধর, নির্ব্বিকল্প সমাধি চাই।"

ঠাকুর একাগ্র হইয়া আবার দেখিলেন—তাঁর অধিষ্ঠাত্রী মহাদেবীকে। সাধক রামপ্রসাদ এইজন্য চিনি হওয়ার অপেক্ষা চিনি খাওয়ার লোভ ছাড়েন নাই; ঠাকুর আর নিরস্ত হইলেন না, জ্ঞানরূপ অসি দিয়া নির্ম্মমভাবে ঐ মূর্ত্তিকে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। প্রবল স্রোতস্বিনী বাধা দূর করিয়া যেমন অপ্রতিহত বেগে ধাবিত হয়, ঠাকুরের বিকল্পহীন চেতনা হু-হু করিয়া উপরে উঠিয়া পড়িল; তিনি বাহ্যজ্ঞান-বিরহিত হইয়া গভীর সমাধি-মগ্ন হইলেন।

তোতাপুরীর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। আনন্দে তাঁহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। নানাবিধ পরীক্ষায় বুঝিলেন—হইয়াছে; নাম-রূপের বাঁধন ছিঁড়িয়া সিংহ-বিক্রমে ঠাকুর ব্রহ্মানন্দে বিভোর হইয়াছেন। তিনি কুটীরের দুয়ার বন্ধ করিয়া সতর্ক রহিলেন—যেন কোন কারণে তাঁর সমাধিভঙ্গ না হয়।

এইরূপ তিন দিন, তিন রাত্রি পরে, শ্রীমৎ তোতা নানাবিধ প্রক্রিয়া-যোগে ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ করিলেন। ঠাকুর নির্ব্বিকল্প সমাধির মধ্যে নিরন্তর বাস করিতে অভ্যস্ত হইলেন। তাঁহাকে সমাধিযোগে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ দেখিয়া শ্রীমৎ তোতা একাদশ মাস দক্ষিণেশ্বরে বাস করিয়া প্রস্থান করিলেন।

ঠাকুর নির্ব্বিকল্প-সমাধির মধ্যে আবার ভাব-মুখে থাকার নির্দ্দেশ পাইলেন। দ্বৈত-ভাবের সাধনায় ভাবমুখে থাকার আদেশ আরও দুইবার তিনি পাইয়াছিলেন; কিন্তু অদ্বৈতভূমিতে আরোহণ

করিয়া তিনি পূর্ব্বের ন্যায় কোন ইষ্টমূর্ত্তির মুখে ঐ কথা শ্রবণ করেন নাই। স্বামী সারদানন্দ বলেন "অদ্বৈত-ভাবে একেবারে একীভূত হইয়া অবস্থান কালে, যখন তাঁহার মন কথঞ্চিৎ পৃথক্ হইয়া, কখন-কখন আপনাকে সগুণ বিরাট্ ব্রহ্মের বা শ্রীশ্রীজগদম্বার অংশ প্রত্যক্ষ করিতেছিল, তখন উহা বিরাট্ ব্রহ্মের মনে ঐরূপ ভাব বা ইচ্ছার বিদ্যমানতা সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়াছিল।" (পৃঃ ৩১৭, সাধকভাব, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ)।

বিষয়টী খুবই জটিল। অদ্বৈতাবস্থা লাভ করিয়া, ঠাকুর পুনরায় কামারপুকুর গিয়া পত্নীর অন্তরে নির্ম্মল প্রেমাঙ্কুর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অদ্বৈত-ভূমিতে আরোহণ করিয়াই তিনি দেখিয়াছিলেন—তাঁহাকে কি করিতে হইবে। সাধনারম্ভকালে, তিনি শিশুর ন্যায় শ্রীশ্রীজগদম্বার চরণতলে বার-বার প্রণতি-সহকারে কাতর নিবেদন জ্ঞাপন করিতেন—"মা, আমি কি করিব না করিব তাহা কিছুই জানি না, তুই স্বয়ং আমাকে যাহা শিখাইবি তাহাই শিখিব"—অদ্বৈত জ্ঞানের স্তরে আসিয়া, তিনি দেখিলেন—তুরীয় ব্রহ্মজ্ঞানের যে সগুণ চিৎশক্তি তাহাতেই তাঁর ভবিষ্যৎ কর্ম্ম সূচিত রহিয়াছে, যে আদেশ দেবী-মূর্ত্তিতে ইষ্ট আরোপ করিয়া তিনি এতদিন পরোক্ষভাবে শুনিতে-ছিলেন, তাহা আত্ম-জ্ঞানে স্বতঃ উদ্ভাসিত হইয়া প্রত্যক্ষ হইল। এই কালেই তিনি দেখিলেন—"রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ"-সৃষ্টির দিব্য সন্ততিগণ শীঘ্রই দক্ষিণেশ্বরে আসিবেন। মথুরবাবুর মুখে তাই ভবিষ্যতে শুনিতে পাই—"কই বাবা, তোমার ভক্তেরা তো আসিয়া উপস্থিত হইল না!" ঠাকুর একটু চিন্তিত হইয়া বলিয়াছিলেন "কি জানি বাবা—তবে কি সব ভুল দেখিলাম!" ঠাকুরের মুখে তখন কুণ্ঠার রেখাপাত করে নাই, অব্যর্থদর্শনজনিত নিশ্চয়তার দৃঢ় রেখাই ললাটে

আঁকিয়া উঠিয়াছিল। মথুরবাবু, ঠাকুর অপ্রস্তুত হইলেন ভাবিয়া, বলিলেন "না বাবা, তোমার দর্শন ভুল হবে কেন, আমি একাই তোমার একশত ভক্ত"—ঠাকুর সে কথায় যে সান্ত্বনা পান নাই, তাহা তাঁর ছাদে উঠিয়া ভক্তদের উদ্দেশ্যে আকুল আহ্বানেই বুঝা যায়।

জীবনের সত্য নির্দ্দেশ সিদ্ধরূপে লাভ করার জন্যই ঠাকুরের সন্ন্যাস, তাঁর নির্ব্বিকল্প-সমাধি। এই অদ্বৈত-সাধনায়, ইষ্টের সহিত অভিন্ন হইয়াই সাধন-আরোপের বন্ধন ছিন্ন করিয়া স্বরূপ-প্রতিষ্ঠ হইতে হয়। নির্ব্বিকল্প-সমাধির মধ্যে ঠাকুরের সবখানি জীবন সত্য মূর্ত্তি লইয়া প্রকটিত হইল; তার কোনখানেই যে ভ্রান্তি নাই, মিথ্যা বা মায়া-পরিচ্ছন্ন তাহা নয়, ইহাই সুপ্রমাণিত হইয়াছে। জীবনের গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই বিশুদ্ধ জীবন ভাগবতবিগ্রহ ভিন্ন আর কি হইতে পারে ?

* *
*

॥ ১১ ॥

ঠাকুরের বেদান্ত-সাধনার পর, ভারতের বিভিন্ন ধর্ম্ম-সাধনার পন্থা অনুসরণ করিতেও প্রবৃত্তি দেখা যায়। অদ্বয়-ব্রহ্মোপলব্ধি করিয়া তিনি আবার আল্লা-নাম জপ করিয়াছেন, খৃষ্টের ভজনা করিয়াছেন—"যত মত, তত পথ" ভগবানকে লাভ করার ব্যাপক বিধি স্বীকার করিয়া ধর্ম্ম-সমন্বয়ের পথ প্রশস্ত করিয়াছেন। এই সকল কথার আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। ঠাকুরের জীবন-সঙ্কেতে যে অভিনব সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা অবধারণ করিলে, কেবল অজ্ঞানের বন্ধন হইতে নহে, ভারতের জ্ঞান-সমুদ্র অতিক্রম করিয়া আমরা অমৃতময় জীবন পাইব।

ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের উপরে যে সন্ন্যাসাশ্রম, ঠাকুর তাহা আশ্রয় করিয়া, ভারতের চরম সাধনা বেদান্তের অনুভূতি উপলব্ধি করিলেন। একবার তাঁর তালুদেশ হইতে রক্তক্ষরণ হইয়াছিল, হলধরের অভিসম্পাতে বুঝি মুখ দিয়া রক্ত উঠিল ভাবিয়াই তিনি আকুল হইয়াছিলেন। কিন্তু যোগ-বিজ্ঞান-সিদ্ধ একজন সন্ন্যাসী শোণিতের বর্ণ দেখিয়া ঠাকুরকে বুঝাইয়া দেন যে, সুষুম্নার দ্বার মুক্ত হওয়ায়, রুধিরপ্রবাহ ঊর্দ্ধমুখী হইয়া জড় সমাধির পথে ছুটিতেছিল; ঈশ্বর-কৃপায় উহা তালু ভেদ করিয়া বাহির হওয়ার পথ পাইয়া ইহা হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে। ঠাকুর হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। জগদম্বার ইচ্ছা জড়-সমাধি নহে, তিনি ভাবমুখে থাকার আদেশ পাইলেন। বেদান্তের অদ্বৈতভূমিতে নির্ব্বিকল্প-সমাধি লাভ করিয়াও তিনি

ফিরিলেন—কেন ফিরিলেন, সেই কথাটুকুর সামান্য আভাস দিতে পারিলেও লেখনী আমার ধন্য হইবে।

ভারতের সাধনা অনির্ব্বচনীয় সামগ্রী। এই মহাসমুদ্রের কূল-কিনারা নাই, আমরা অকূলে সাঁতার দিয়াই মরিলাম, কূলের সন্ধান মিলিল না। একটু স্থির হইয়া দেখিলে, ঠাকুর কিন্তু জাতির জীবন-তরী কিনারায় পৌঁছাইয়া দিয়াছেন, ইহার সহজেই উপলব্ধি হয়। কিন্তু উপলব্ধি করাই সবখানি হওয়া নয়, অনুভূতি ও দর্শন হইলেই হয় না; তদ্‌ভাবে ভাবিত, তদবস্থায় জীবন গঠিত করার উপরেই ভারতের সিদ্ধি নির্ভর করে। কিন্তু আমরা এক ছটাক মন লইয়া অতীতের পন্থানুসরণ করিতেই প্রবৃত্ত। শঙ্কর, বুদ্ধ, কৃষ্ণ, চৈতন্য কি করিয়াছেন, তাহার বিশ্লেষণ করি। সেই কথাগুলি বার-বার বিচিত্র মনের রঙে নানাভাবে রঞ্জিত করিয়া পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করি, সিদ্ধি বলিয়া পরিচয় দিই। ভারতের যে দাসত্ব, তাহা আমাদের অধ্যাত্ম-জীবনও অধিকার করিয়াছে। আমরা গতিহীন, স্তব্ধ। আমাদের যে অনেক করিবার আছে, আগাইবার আছে, তাহা ভুলিয়া যাই। এই ক্ষুদ্র মনের উপর অতীতের আধিপত্য ষোল আনা যদি সার্থক হয়, আর অবশিষ্ট কিছু আছে বলিয়া বোধ হয় না। কেহ কর্ম্মত্যাগী পরমহংস হইয়া বসেন, কেহ পুরুষোত্তমের আসন অধিকার করিয়া নিশ্চিন্ত হন। সবই মনের পঙ্গুত্ব, মনের বিকার। ঠাকুর এ দায় হইতে সহজে মুক্তির উপায় জীবন-সাধনায় ব্যক্ত করিয়াছেন, আমাদের তাহা গ্রহণ করিতে হইবে।

সাধনার শ্রেষ্ঠ রহস্য—লয়। মনে-মনে যে লয়—তাহার পরিণাম গতানুগতিককে আশ্রয় করিয়া কেবল বাহ্যাড়ম্বর। ইহার পরিণাম জল-তিলকের ন্যায় সহজেই শুখায়, বিশ্বের বুকে পথের সঙ্কেত অমর

রেখায় আঁকিয়া দেয় না। ঠাকুরের জীবনেই ইহা দেখা যায়। তিনি নিজের জৈবিক পুরুষত্ব বিসর্জ্জন দিতে প্রত্যক্ষভাবে ব্রাহ্মণীর আশ্রয়ে প্রকৃতি-ভাবের আরোপ করিলেন; যখন সমস্ত হৃদয়খানি মধুর ভাবে প্রকৃতি-লীন হইল, তখন তিনি স্বয়ং ইহার পরীক্ষা করিলেন। এই অবস্থায় তাঁর চিত্তে পুরুষ-ভাবের উদয় পর্য্যন্ত হয় নাই। এই অবস্থাতেই তিনি জনকদুহিতা সীতাদেবীকে দর্শন করেন; শ্রীমতী রাধারাণীর কামগন্ধহীন শ্রীমূর্ত্তিরও সাক্ষাৎকার লাভ করেন, সে রূপ সত্যই বর্ণনাতীত—"শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে সর্ব্বস্বহারা সেই নিরুপম পবিত্রোজ্জ্বল মূর্ত্তির মহিমা ও মাধুর্য্য বর্ণনা করা অসম্ভব, শ্রীমতীর অঙ্গকান্তি নাগকেশর পুষ্পের কেশর সকলের ন্যায় গৌরবর্ণ ছিল" (পৃঃ ২৮৫, সাধকভাব, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ)—এইটুকু মাত্র অনুভূতির বর্ণনা তাঁহার মুখে পাই। এই সকল দর্শন ও অনুভূতি আত্মস্বরূপেরই। যে ভাবসিদ্ধ হইলে যে রূপের দর্শন হয়, তিনি সেই ভাবসিদ্ধ হইয়া সেই মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন। মধুর-ভাব-সাধনের চিরপ্রসিদ্ধ গোপী-ভাবে সিদ্ধ হইয়াই তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন হইয়াছিল। এই সকল কথা সাধারণের নিকট অলৌকিক; কিন্তু জীবন সিদ্ধ না হইলেও, যাঁহাদের সামান্য মাত্র বুদ্ধির বিমলতা হইয়াছে, তাঁহাদের নিকট ইহা সহজেই বোধগম্য হইবে। শাস্ত্রে আছে অনেক কথা, তিনি শাস্ত্র লইয়া পাণ্ডিত্য প্রকাশ করেন নাই, জীবন দিয়া তাহা সিদ্ধ করিয়াছেন। ভক্ত, ভগবান্ ও ভাগবত যে অভিন্ন, তাহাও তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ইহা রহস্য বটে, কিন্তু সত্য এবং প্রত্যক্ষ—সকলের পক্ষেই ইহা সাধ্য হইতে পারে।

মন লইয়া যে সাধনা তাহা গণেশের ত্রিভুবন প্রদক্ষিণের ন্যায়, মাতৃমূর্ত্তিকে পরিবেষ্টন মাত্র; মনে-মনেই সব বুঝিয়া লইলে,

যেখানকার যাহা, তাহা প্রত্যক্ষ হয় না। আমরা অন্নময় কোষ যেমন করিয়া বুঝি, প্রাণময় কোষের রহস্য তেমন করিয়া বুঝি না; ইহার কারণ আর কিছুই নহে, মনের পটে সব কিছু ঠিকঠাক প্রতিফলিত হয় না। মনকে রাখিয়া কোন মতেই চলা যায় না। যে মনে ত্রিভুবন প্রতিবিম্বিত, সে মন সর্ব্বক্ষেত্রেই প্রতিবিম্বের জগৎ গড়িবে; এইজন্য মনকে ঠাকুর মাতৃপদে বাঁধা রাখিয়া সাধন-সমরে মাতিয়াছিলেন। এই মন বাঁধা দেওয়ার রহস্যই যে সাধনার গোড়ার কথা! তাই তিনি ষোল আনা মন এক করিবার উপদেশ দিতেন। সাধনার প্রায় সর্ব্বক্ষেত্রেই আজ মনকেই আমরা প্রশ্রয় দিই; মনের অনুশীলন হয়, মন যাহা দেখায়, যাহা শুনায়, যাহা উপলব্ধি করে, তাহাই ঢাক পিটিয়া প্রচার করি। মনের পরিধিও যে অসীম, কিন্তু সবই প্রতিবিম্ব, এই হেতু মূলের আস্বাদ পাই না—আর এই আস্বাদের অভাবেই, ভারতের সাধনায় যে দিব্য রচনার অমোঘ বীর্য্য তাহা আমাদের ভাগ্যে মিলে না।

আত্মদর্শনের সন্ধান ঠাকুর আত্মার দ্বারাই সিদ্ধ করিয়াছেন। তাই ঠাকুরের পথ ছিল অব্যর্থ; তন্ত্রে, সহজিয়ায়, বেদান্তের লক্ষ্য নির্ব্বিকল্প-সমাধিতে সে অমর চেতনা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। তিনি সমাধি ভেদ করিয়া একটা সৃষ্টির সঙ্কেত দিলেন।

যখন তিনি জ্ঞানাজ্ঞান, সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ ইষ্টের চরণে উৎসর্গ করিতেছিলেন, তখন বুদ্ধির প্রেরণা অন্তরের অনুভূতির শুধু প্রতিধ্বনি করে নাই; তিনি কার্য্যতঃ তাহা অনুশীলন ও সিদ্ধ করিয়াছেন। মনের ধর্ম্মগুলি বিসর্জ্জন করিয়া তিনি মনকে প্রথমেই বাঁধিয়া ফেলিয়াছেন। জগদম্বার অনুগ্রহবোধে যে আত্মচৈতন্য অতঃপর তাঁহার সপ্তকোষ ভেদ করিয়া অক্ষর ব্রহ্মে সংযুক্ত হইল, তাহা তিনি

সিদ্ধিকালের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত 'আমি বা আমার' এই সংস্কারযুক্ত করিয়া রাখেন নাই। সবই ইষ্টমূর্ত্তির করুণায় সিদ্ধ হইতেছে—এই সহজ বোধই যে বিজ্ঞান, যাহা অধঃ ও ঊর্দ্ধকে অখণ্ড নিত্যবস্তু বলিয়া অবধারণ করে, তাহা তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন। নিরহঙ্কার, বাসনা-মুক্ত হওয়ার উপায়—মনের স্থিরত্ব-বিধান। মাতৃচরণে তিনি এই মনকে বলি দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়াই অতঃপর যে বোধ জন্মিত, তাহা মনোমত না হইয়া বিজ্ঞানের বস্তুরূপেই ভাসিয়া উঠিত। ঠাকুর এত বুঝিয়া যদি চলিতেন, তবেই গোল বাধিত—সাধনার ক্ষেত্রে উহাই তো সঙ্কট, মন যে কোথাও মাথা নত করে না! বিজ্ঞান সাধনার বস্তু নহে, উহা মনের দৌরাত্ম্যে পঙ্গু নিরুদ্ধ, মনের স্তব্ধতার সঙ্গেই মেঘাপসরণে সূর্য্যকিরণের ন্যায় উহা নীচকে যেমন উজ্জ্বল করিয়া তুলে, উপরের দিক্‌টাও তেমনি খুলিয়া দেয়। ঠাকুর নিঃশ্বাসের জোরে ষট্‌চক্র ভেদ করেন নাই, বিজ্ঞানের সাহায্যেই চিদ্‌ঘন ইষ্টকে দর্শন করিতেন। এই ইষ্ট তো অন্য বস্তু নহে, আত্মবস্তু। ইহাই সৎ। এই সৎ রূপের রাজ্য ছাড়াইয়া যাওয়াও যায়, আবার না যাওয়ার কথাও একেবারে মিথ্যা নয়; রূপ ও অরূপের লীলা আলো-আঁধারের খেলা। ইহাই তো নিত্যসৃষ্টির রহস্য। লীলাময় শ্রীকৃষ্ণ তাই এই দুইয়ের উপরে। কথা সহজ, আবার গীতা ও উপনিষদের কথায় ঘোরাল করিয়া বলাও যায়। বাংলার সহজ সাধনায় ইহা কিন্তু সিদ্ধ বস্তুরূপে প্রত্যেক বাঙ্গালীর করা-মলকবৎ হইয়া আছে; কেবল আত্ম-সাধনায় ইষ্টমুখী হওয়ার অভাবে গভীর রহস্যময় জটিল বোধে আমরা সাধনার আবর্ত্তে আমাদের জীবনকে অস্বাভাবিক করিয়া তুলিতেছি।

ঠাকুর যখন দেখিলেন—জ্যোতির্ম্ময় কৃষ্ণমূর্ত্তি হইতে দড়ার মত

একটী জ্যোতিঃ বহির্গত হইয়া প্রথমে ভাগবত গ্রন্থকে, তারপর তাঁর নিজ বক্ষঃস্থলে সংলগ্ন হইয়া রহিল ; তখন বুঝা যায়, তিন এক এবং একই তিন—ইহা তাহার লক্ষণ ছাড়া আর অন্য কিছুই নয়। গীতার ক্ষরাক্ষর পুরুষোত্তম ত্রিতত্ত্ব অন্যভাবে এই তিনেরই ঐক্য ঘোষণা করিয়াছে ঃ

"যস্মাৎ ক্ষরাদতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥"

মনের জগতে, বস্তু হইয়াই ইহা বোধগম্য হয়। বেদ অপৌরুষেয় ; ইহার কারণ, সত্য সীমার পারেই বিধৃত—তাই চিদ্‌ঘন ইষ্টকে তিনি জ্ঞানাসি দিয়া ছেদন করিয়াছিলেন। অসীমের মাঝে নিজেকে তো হারাইবার উপায় নাই ! যে বাণী এতদিন সীমার মধ্যে ঝঙ্কার তুলিয়া সংশয়লিপ্ত ছিল, তাহা মুক্তি পাইয়া সিদ্ধরূপে পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করিল। বেদান্ত-সাধনার পর, ঠাকুরের ষোড়শীপূজার অনুষ্ঠান-তত্ত্বে আমরা ইহা সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিব।

ঠাকুরের জীবন আলোচনা করার অধিকার যাঁহারা পাইয়াছেন, তাঁহারা অধিরোহণের দিক্‌টাই স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন ; এই প্রয়োজন সিদ্ধ করা তাঁর নিত্য সঙ্গী ভিন্ন অপরের পক্ষে সম্ভবপর হইত না। আমরা দেখিব—তাঁর অবতরণের কৌশল। কেন-না, আমরা যে উত্তর-পুরুষ, আমাদের কণ্ঠে তো ভক্তির উদ্গান উঠিয়াই হৃদয়কে সান্ত্বনা দিবে না ; আমরা চাহি গতি, আমরা কেবলই বলিব—"ততঃ কিম ?" এই প্রশ্নের চরম মীমাংসা এই অতি-মানুষের জীবন হইতে পাইয়াছি বলিয়াই আকুল আগ্রহে সেই সর্ব্বতত্ত্বটুকু প্রকাশ করিতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছি, যে তত্ত্ব সকল সমস্যা বিদীর্ণ করিয়া ভারতের মহিমা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবে।

উপনিষদে ব্রহ্মানুভূতির তিনটী পর্য্যায়ের কথা উক্ত হইয়াছে। প্রথম—সর্ব্বভূতে নিজেকে দর্শন, দ্বিতীয়—নিজের মধ্যেই সর্ব্বভূতের অনুভূতি, তৃতীয়—আপনা হইতেই সর্ব্বভুত সৃষ্টির উপলব্ধি।

"যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং.....................
যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ"

অদ্বৈত জ্ঞান-সাধনায়, পর-পর এই তিনটির প্রত্যক্ষ আস্বাদ ঠাকুর পাইয়াই ভারতের সাধনাকে সার্থক করিয়াছেন। সর্ব্বভূতে আত্মদর্শনে মানুষ বিশ্বপ্রেমিক হইতে পারে; কেন-না, এই অবস্থায় মানুষের চেতনা সর্ব্বগত (cosmic) হইয়া পড়ায়, প্রত্যেক বস্তুর সহিত নিজকে সংযুক্ত বলিয়া মনে হয়। দক্ষিণেশ্বরেব তৃণাচ্ছাদিত মাটির বুকে কেহ হাঁটিলে, ম্রিয়মাণ তৃণগুচ্ছের বেদনাও ঠাকুর উপলব্ধি করিয়াছিলেন; আহত পতঙ্গের ব্যথায় তিনি শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন। আবার কথায়-কথায় সর্ব্বভুত আপনার মধ্যে সংহৃত করিয়া ভূমার মাধুর্য্যে ও ঐশ্বর্য্যে সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেন। এই অবস্থা-দ্বয় অতিক্রম করিয়া, তিনি আত্মোপলব্ধির তৃতীয় পর্য্যায়ে উঠিয়া নিজেকে নিঃসংশয়ে আবিষ্কার করিলেন। ইহা ভারতের সাধনপথে একান্ত নূতন কথা নহে—পথের সঙ্কেত ছিল, কিন্তু ঠাকুরের মত করিয়া কেহ সাধিতে পারে নাই। মনের মানুষ এই বিরাট্ ব্রহ্মজ্ঞানের খরকিরণে গলিয়াই অস্তিত্ব হারাইয়াছে। এখানে যে 'ন চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাক্ ন মনঃ'—অবিনশ্বর শাশ্বত চেতনা, তাহার কি লয় হয়? মুক্তি-মোক্ষের আদর্শবাদ ঠাকুর চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ভাঙ্গিয়াছেন; কিন্তু তবুও উত্তরপুরুষগণ তাহা লক্ষ্য না করিয়া, ভূমানন্দে নিজেকে ফুরাইতে মায়াবাদের গৈরিক পতাকা উড়াইয়াছেন। কারণ অন্য কিছু নহে; যে বস্তু লইয়া সাধনা, সেই

বস্তুর অভাবে ভারতের সাধনপথে এই মনের যাত্রী হাটে মামা হারাইয়া দিগ্‌ভ্রান্ত—ভারতের অধঃপতন এই ঘোর অজ্ঞানতাপ্রসূত।

সন্ন্যাসগ্রহণের পরেই, ঠাকুর নিজ শয্যাপার্শ্বে পরিণীতা ভার্য্যাকে স্থান দিয়াছেন, নির্ব্বিকল্প সমাধির আস্বাদ লাভ করিয়াই তিনি সৃষ্টির বনিয়াদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন—মুক্তি ও লয়ের প্রতীক্ষায় অবশিষ্ট পরমায়ুঃ পৃথিবীর কিছু শ্রেয়ঃ বিধান করিবে, এই বোধে নহে। তিনি নিজ 'মিশন' সম্বন্ধে বলিয়াছেন :

(১) "আমি ঈশ্বরাবতার"
(২) "আমার মুক্তি নাই"
(৩) "আমার দেহান্তর কবে হইবে জানিয়াছি"
(৪) "যত মত, তত পথ, সর্ব্ব ধর্ম্ম সত্য"
(৫) "অবস্থাভেদেই দ্বৈত, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত মত মানব গ্রহণ করে"
(৬) "মানবের উন্নতি কর্ম্মযোগাবলম্বনে সাধিত হইবে"
(৭) উদার মতের সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করিতে হইবে"

—(পৃঃ ৩৯০, সাধকভাব, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ)

অতএব ভারতের সন্ন্যাস অবস্থা-ভেদের কথা। সন্ন্যাসের পরও জীবন আছে, সে জীবন সকলের। এ জীবন যে শুধু অবতারের হইবে, পরমহংসের হইবে, সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর হইবে, এমন কোন কথা নাই। যাহাই হউক না, উহা আত্মারই কল্পমূর্ত্তি। নিজের ব্যষ্টিজীবনে যে রূপের প্রকাশ, তাহা ব্যতীত সকল প্রকাশের তৃপ্তিই আমি উপভোগ করিব; আমি ব্রহ্মচারী যতি হইতে পারি, কিন্তু গার্হস্থ্যের ছন্দঃ যে লীলা তাহাও আমাতে বিধৃত; কেন-না, আমি যে "আত্মৈবাভূৎ"—এই উত্তম রহস্য

ভুলিয়াই আমরা মজিয়াছি। ভারতের সাধনা সন্ন্যাস আমাদের মজায় নাই। কালধর্ম্মে আমরা পতিত। আবার যুগের ভেরী বাজিয়াছে, তাই সন্ন্যাসের পরই জীবনের সন্ধান পাওয়া গেল। মায়াবাদের কুহেলিকা অপসৃত; ভারতের পঞ্চম বর্ণ, পঞ্চম আশ্রমের প্রতিষ্ঠা ঠাকুরের জীবনেই সূচিত হইয়াছে, ইহা আরও স্পষ্ট করিয়া দেখাইব।

* *
*

॥ ১২ ॥

ঠাকুরের সাধনা শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে পারিপার্শ্বিক অবস্থারও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। সে সকল কথার উল্লেখ এই প্রসঙ্গে প্রয়োজন মনে করি না। তবে ঠাকুরের স্বাস্থ্য একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। কঠিন আমাশয় রোগে তিনি আক্রান্ত হইয়াছিলেন। ১২৭৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে তিনি জন্মভূমি-সন্দর্শনে গমন করেন। সিদ্ধজীবনের ভিত্তির উপরেই তাঁর দাম্পত্যজীবনের অপূর্ব্ব রহস্য বিধৃত হইয়াছে, এই কথাটুকু যথাযথ ব্যক্ত করিতে পাইলেই এই দীর্ঘ আলোচনা সার্থক হয়।

ঠাকুর আমূল সিদ্ধজীবন লইয়া অবতীর্ণ হন; কিন্তু সাধনার ক্রমানুযায়ী তাঁহাকে পর-পর তিনটী অবস্থার ভিতর দিয়া অতিক্রম করিতে হয় এবং প্রত্যেক পর্য্যায়েরই তিনি সত্য দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি মিথ্যা হইতে সত্যে উপনীত হন নাই, সত্য হইতে সত্যেই অটল প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। নিত্য সিদ্ধের ইহা অকাট্য নিদর্শন।

ইহাই ভাগবত চরিত্রের লক্ষণ। সংস্কার-দুষ্ট, মোহযুক্ত জীবন উত্থানপতনের ভিতর দিয়া শুদ্ধি ও মুক্তি লাভ করে; কিন্তু আত্মমায়া আশ্রয় করিয়া যে চৈতন্যশক্তি ধরাতলে অবতরণ করে, তাহার প্রকাশ-বিপর্য্যয় নাই। অব্যবস্থিত চিত্তের পরিচয় এই ক্ষেত্রে আদৌ পাওয়া যায় না, গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত জীবন অব্যর্থ লক্ষ্যেই অগ্রসর হয়। ঠাকুরের তাই মূল জীবন প্রেরণার কখনও ব্যত্যয় হয় নাই, ঘটনা-বৈচিত্র্যে আদর্শ কোথাও মলিন হইয়া পড়ে নাই, অবিকৃত

অখণ্ড পরিবর্ত্তনহীন তাঁর পূত জীবন-প্রবাহ এইজন্য দিবসের আলোর ন্যায় উজ্জ্বল এবং স্পষ্ট। পৃথিবীর মোহ তাঁহার চরণতলেই নৃত্য করিয়াছে, দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন কোথাও করে নাই—এইজন্য তাঁহাকে শ্রীভগবানের মূর্ত্ত বিগ্রহ বলিয়া স্বীকার করিতে বাধে না।

ত্যাগ ও বৈরাগ্যের স্বর্ণকান্তি ভোগ ও ঐশ্বর্য্যের সংস্পর্শে মলিন হয় নাই, আসক্তিকামনামুক্ত জীবনের পবিত্র দাম্পত্যপ্রণয় একটী মুহূর্ত্তের জন্য কামকলুষ আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে নাই, অখণ্ড সনাতন জীবনচ্ছন্দঃ সমাধির আবর্ত্তে লয় পায় নাই, সত্যের বীর্য্য পৃথিবীর কুহক ভেদ করিয়া নিত্য-স্বরূপেই উদ্ভাসিত হইয়াছে। সে কুহক—সংসার-মোহ হইতে ভারতের তপস্যা পর্য্যন্ত একে-একে তাঁহাকে ভুলাইতে চাহিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই এই সত্যের অটলপ্রতিষ্ঠ হিমাদ্রিকে টলাইতে পারে নাই—যুগদেবতার ইহাই অপূর্ব্ব মহিমা!

সাধনার প্রথম পর্য্যায়—আত্মসমর্পণের দীক্ষা। এই সময়ে তিনি মনোলয়ের জন্য, শ্রীশ্রীজগদম্বার পদমূলে জীবন ঢালিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছেন। সমর্পণের সাধনায় যে শ্রদ্ধা, তৎপরতা, যে ইন্দ্রিয়সংযম তাহার কিছুমাত্র ক্রটি দেখা যায় নাই; অহঙ্কৃত মন নিরন্তর ইষ্টমূর্ত্তির চরণে মাথা নত করিয়া কেবলই প্রার্থনা করিয়াছে বিশুদ্ধা ভক্তি—যাহা পরম প্রেম-স্বরূপ, যাহা লাভ করিলে মানুষের কোন কামনা থাকে না, কোন জ্ঞানের অভাব হয় না, যাহা তৃপ্তি, সিদ্ধি, অমৃত। এই বস্তুর একনিষ্ঠ সাধকের বুকে যে বৈরাগ্যের আগুন জ্বলিবে, তাহা অবধারিত; তাই এই যুগেও মন যে মূর্ত্তিতে প্রকট হইয়াছে, তাহা সত্যেরই মূর্ত্তি। ঠাকুর এই সময়ে দেখেন—"সহসা মেঝে হইতে কুয়াসার মত ধুঁয়া উঠিয়া সামনের কতকটা স্থান পূর্ণ হইয়া গেল, তারপর দেখি তাহার ভিতরে আবক্ষঃলম্বিত-শ্মশ্রু একখানি গৌরবর্ণ জীবন্ত সৌম্য মুখ।

ঐ মূর্ত্তি আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে দেখিতে-দেখিতে গম্ভীর স্বরে বলিলেন "ওরে তুই ভাবমুখে থাক, ভাবমুখে থাক্, ভাবমুখে থাক্। —(পৃঃ ১৬০, সাধকভাব, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ)।

সাধনার রহস্য যাঁহাদের নিকট একান্ত দুর্জ্ঞেয় বস্তু নহে, তাঁহারা অনায়াসেই বুঝিবেন যে, মনের স্বরূপদর্শন ভিন্ন ইহা অন্য কিছু নহে। বাসনাতরঙ্গে বিক্ষুব্ধ মনোবৃত্তি ঈশ্বরযুক্তি পাইয়া স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় শুদ্ধ নির্ম্মল হইয়াছে এবং রূপপরিগ্রহপূর্ব্বক জীবনের অব্যর্থ নির্দ্দেশ যাহা, তাহাই ব্যক্ত করিয়াছে।

ইহার পর, বিজ্ঞানের সাধনা। মনের লয়ে বিজ্ঞান স্বতঃ-স্ফুরিত হয়।

"তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি।"

ঠাকুরের যোগসংসিদ্ধ উন্নত অবস্থার পরিচয় নূতন করিয়া দিতে হইবে না। আমি কেবল দেখাইব—সত্যের শাশ্বত স্বভাব সকল অবস্থায় অখণ্ড ও পরিবর্ত্তনহীন হয়। তিনি যখন বিজ্ঞানের কোঠায় উঠিলেন, তখনই ইষ্টকে আপনার মধ্যে দেখার কৌশল আবিষ্কৃত হইল। এই অবস্থায় পূর্ব্বের বাণীই প্রতিধ্বনি তুলিল—কিন্তু সাধনার যে অব্যর্থ নীতি পুংস্ত্ব ও স্ত্রীত্ব বিসর্জ্জন দিয়া গুণাতীত হওয়া, তাহার কি চমৎকার নিদর্শন এই ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ হয়! তিনি দ্বিতীয়বার দেখিলেন—"মা ঐ সময়ে 'রতির মা' নাম্নী একটী স্ত্রীলোকের বেশে ঘটের পার্শ্বে আবির্ভূতা হইয়া বলিতেছেন—"তুই ভাবমুখে থাক্।" (পৃঃ ১৬০, সাধকভাব, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ)।

ঘটনা অভাবনীয়; কিন্তু সাধনার নিগূঢ় সঙ্কেতই ইহার মধ্যে আমরা খুঁজিয়া পাইব। সংশয়মুক্ত শুদ্ধ চিত্তেই এইরূপ তত্ত্বদর্শন হয়। ইহাও স্বরূপ-দর্শন, মনোলয়ে চিৎশক্তির সহিত জীব-

ভাবের পরম যুক্ততা। ইহাই "নারীর মিশালে নারী" হওয়ার উত্তম রহস্য। ঠাকুর প্রকৃতিসিদ্ধ হইলেন।

তারপর, বৈধী সাধনার ক্রমভেদ। সে কথা যথাসম্ভব পূর্ব্বে ব্যক্ত করা হইয়াছে। গুণাতীত অবস্থায় পূর্ণ যোগসিদ্ধ হইয়াও, তিনি কোন মূর্ত্ত দেবতার কণ্ঠে নহে, "শ্রীশ্রীজগদম্বার অশরীরী বাণী প্রাণে প্রাণে শুনিতে পাইলেন—"তুই ভাবমুখে থাক্।" —(পৃঃ ১৬০, সাধকভাব, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ)।

হৃদয়স্থিত সংশয় জ্ঞানাসি দ্বারা যেমন ভিন্ন হয়, সমাধির আবর্ত্তও তেমনি সত্যের বজ্র দিয়া তিনি বিদীর্ণ করিলেন। বেদের রাশিকৃত মন্ত্রচ্ছন্দে আবৃত ভারতে যে নূতন আশ্রমের নির্দ্দেশ আছে, তিনি তাহা আত্মজীবনে প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যত হইলেন। তাই বেদান্তযোগ-দীক্ষিত সন্ন্যাসব্রতীকে আবার আমরা পরিণীতা ভার্য্যার সহিত একত্র হইয়া ভবিষ্যৎ সৃষ্টির পথ মুক্ত করিতে দেখি।

ঠাকুর কামারপুকুরে আসিলেন—সঙ্গে আনিলেন ব্রাহ্মণীকে। ইহার মধ্যেও সাধনার অলৌকিক রহস্য নিহিত আছে। এইগুলি ভবিষ্যজাতির নিকট যেন অস্পষ্ট থাকিয়া না যায়। প্রাকৃত জীবনে তত্ত্ব দুর্ব্বোধ্য হউক, ইহা স্বাভাবিক—কিন্তু উচ্চ অধ্যাত্মতত্ত্বের মানুষের কাছেও ইহা উপেক্ষিত হয়, তাহা কি পরিতাপের কথা নহে!

নিরন্তর নির্ব্বিকল্প সমাধির মধ্যে দীর্ঘ দিন অবস্থান করিয়াও সত্যের নির্দ্দেশে তাঁর অবতরণ ঘটিল। আরোহণে তুরীয় অবলম্বন যুক্তিহীন নহে; শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, সেবা, সংযম—ভাবের আশ্রয়েও সিদ্ধ হয়। এই বিষয়ের আলোচনা-ক্ষেত্র ইহা নহে, অতএব এই সকল কথা এক্ষণে অবান্তর। কিন্তু অবতরণ জীবনের, জীবন্ত ক্ষেত্র ইহার জন্য প্রয়োজন হয়। ইহা অন্য কিছু নহে, নিজের হৃদয়কে প্রকাশ করিয়া

ধরা মাত্র। হৃদয় প্রেমের ক্ষেত্র, প্রেম সৃষ্টির বীর্য্য। ইহা হইতেই রূপের উৎপত্তি। যে সাধনার গতি ছিল ঊর্দ্ধমুখ, সেখানে সব কিছুকে তর্পণেই লয় করিতে হইয়াছিল। মনের লয় বিজ্ঞানের লয়, আপনার পুংস্ত্ব, নারীত্ব—এক কথায় "আত্মপ্রকৃতির" লয়। লয়ের অবস্থা চরম সমাধি, ইহা এক অবস্থার কথা। অন্য অবস্থাও যে থাকিতে পারে, সে কল্পনা কাহারও ছিল না। মৃত্যুর পর জীবনের কল্পনা তর্কযুক্তিতে যেমন সিদ্ধ হয় না, সমাধির পর জীবনের রূপান্তর তদ্রূপ তর্কে অসিদ্ধ, কিন্তু অনুভূতিগম্য—ঠাকুরের জীবনে ইহা প্রত্যক্ষ হইয়াছে। ইহাই নবযুগের নূতন বার্ত্তা।

ঠাকুরের প্রয়োজন হইল—হৃদয়প্রকাশের ক্ষেত্র। তিনি আরোহণ-যুগে যেমন স্তরের পর স্তর সত্যকেই দেখিয়া গিয়াছেন, তদ্রূপ অবতরণের ক্ষেত্র রচনাও করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন অবস্থাই তিনি বিনা পরীক্ষায় গ্রহণ করেন নাই। অথবা দৈব-নির্দ্দেশ যাহা, তাহা জীবনের মহাসমস্যার যুগে নিতান্ত অতর্কিতেই ঘটিয়া যায়; তখন তাহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয় না—একদিন অকস্মাৎ উপরের প্রেরণায় তাহার সকল অর্থ আবিষ্কৃত হইয়া পড়ে। ঠাকুরের কোন কিছু মনগড়া হয় নাই, শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রেরণায় তাঁহার জীবনগতি নিয়ন্ত্রিত হইত। সব কথাই যে তাঁহাকে সঙ্গে-সঙ্গে বুঝিতে হইবে, এমন ব্যবস্থা জগতে নাই। সর্ব্বজ্ঞ যিনি, তাঁহারই কাছে যুগপৎ কার্য্যকারণ বিধৃত। ঠাকুর ছিলেন সিদ্ধ যন্ত্র। তাই পরশমণির পরশের ন্যায় তাঁর সকল স্পর্শই দিব্য হইয়াছে। এ আদর্শের তুলনা নাই।

ঠাকুর সাধনা করিতে-করিতেই এক প্রকার ভাবোন্মাদ হইয়া নিজেই স্বীয় পত্নীর সন্ধান করিয়াছিলেন। পঞ্চমবর্ষীয়া বালিকার পাণিগ্রহণ করিয়া দক্ষিণেশ্বরে আবার মাতৃপ্রেমে সব কিছু ডুবাইয়া

দিয়াছিলেন, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কুলাচরিত প্রথানুসারে একবার ঠাকুর শ্বশুরালয়ে গিয়া সপ্তমবর্ষীয়া পত্নীকে দেখিয়া আসেন। সেদিন শ্রীশ্রীসারদাদেবী ঠাকুরকে কি ভাবে দেখিয়াছিলেন, তাহা কে বলিবে? তবে সলজ্জা বালিকাকে খুঁজিয়া ঠাকুরের ভক্ত হৃদয় একমুঠা পদ্মফুল তাঁহার চরণে অর্ঘ্য দিয়া বালিকার হৃদয়ে যে একটী গরিমার রেখা আঁকিয়া দিয়াছিলেন, তাহা আমরা শ্রীমৎ সারদানন্দ মহারাজের "লীলাপ্রসঙ্গ" পাঠ করিয়া জানিতে পারি। এই ঘটনা বালিকার প্রাণে সেদিন কোন নূতন ভাবের আস্বাদ না দিক, বয়সের সঙ্গে ইহা যে অঙ্কুরিত হইয়া, ঠাকুরের সেবায় তাঁর চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা তাঁর ভবিষ্য জীবনের প্রতি ঘটনায় প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

শ্রীমার সহিত ঠাকুরের দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার হয় তাঁর যৌবনবিকাশের প্রভাতেই। মায়ের বয়স তখন চতুর্দ্দশ বৎসর মাত্র। বিবাহের পর ঠাকুরের সহিত সম্বন্ধ-নির্ণয় এই সময়েই হয়; ইহার পূর্ব্বে হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। শ্রীমাকে ঠাকুর হৃদয়ের অবিভাজ্য স্বরূপ বলিয়া তখনও স্বীকার কবিতে পারেন নাই। এই কারণেই বিবাহের পর একান্ত উদাসীন হইয়া দীর্ঘ দিন দক্ষিণেশ্বরে সাধননিরত থাকায় কোন উদ্বেগ তিনি অনুভব করেন নাই। তিনি হৃদয়ের ধর্ম্ম আবিষ্কার করিলেন ব্রাহ্মণীর সংসর্গে; প্রেমের মাধুর্য্যে ও ঐশ্বর্য্যে তাঁর হৃদয় দিব্য হইল। ব্রাহ্মণী এই হৃদয়ের দাবী করিয়া বসিলেন। ঠাকুর অপার্থিব সম্পদ্ লাভ করিয়া যখন ভবিষ্যতের প্রতীক্ষায় অন্তরের দিকে একাগ্র, সেই সময়ে বেদান্তসাধনার ডাক আসিল। তিনি যে দিব্য সম্পদ্ পাইয়াছিলেন তাহা হৃদয়স্থিত সম্পদ্, পৃথিবীর স্পর্শে তাহা মিলন হইতে পারে; তাই শ্রীশ্রীজগদম্বা সে বস্তুও লয়ের সাধনায় নির্ম্মল করিয়া লইতে আদেশ দিলেন। শ্রীমৎ তোতাপুরীর নিকট

দীক্ষাগ্রহণে এই হেতু তিনি ব্রাহ্মণীর নিকট হইতে বিশেষ বাধা পাইতেন। ব্রাহ্মণী যে ছিলেন প্রেমের কাঙ্গালিনী। তাঁহার হৃদয়ে যে জীবনদেবতার আসন বিস্তৃত ছিল তাহা তো তুরীয় আস্বাদে সার্থক হইবার নহে—ব্রাহ্মণী যে ঠাকুরকে হৃদয়াসনে বসাইয়া নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। "ব্রাহ্মণী ঠাকুরের ভোজনাবশিষ্ট দেব-প্রসাদ বলিয়া গ্রহণ করিলেন এবং ঠাকুরের শরীরমনাশ্রয়ে ৺রঘুবীরের জীবন্ত দর্শন স্থায়ীভাবে লাভ করিয়া প্রেমগদ্গদ অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায় বাষ্পবারি মোচন করিতে-করিতে বহুকালের পূজিত রঘুবীর শিলাটিকে সযত্নে গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত করিলেন।" (পৃঃ ২০১, সাধকভাব, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ)

ব্রাহ্মণীর এই অধিকারটুকু লাভ করার সুযোগ হইয়াছিল—ঠাকুরের হৃদয় তখন ইষ্টময় হইয়া নবসৃষ্টির পথ খুঁজিতেছে; এই অবকাশে ব্রাহ্মণী আপনার হৃদয়ে ঠাকুরকে স্থান দিয়াই পরিতৃপ্তি পান নাই, জীবনের সাধনায় ঠাকুরের হৃদয় কামনা করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীজগদম্বার ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ। হৃদয়েরও নিত্য রূপ আছে, সে ক্ষেত্রের ব্যভিচার নিবারণ করার একমাত্র উপায়—নির্ব্বিকল্প-সমাধি, একেবারে অদ্বয় ব্রহ্মসাগরে ডুব দিয়া অমৃতময় হওয়া। ঠাকুর যখন সে পথ অবধারিত ভাবে ধরিলেন, ব্রাহ্মণী তখনও ধৈর্য্যহীন হন নাই। তাঁর অন্তর্য্যামী জানিত—বেদান্তসাধনায় ঠাকুর হৃদয় পাইবেন না, লয়ের পথ শুষ্ক প্রেমহীন; এই আপত্তিটুকু করিয়াই তিনি শেষের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলেন। তাঁহার আশা-ভঙ্গ হইল কামারপুকুরে, বিয়োগান্ত নাটকের ন্যায় এই দৃশ্য বড়ই মর্ম্মস্পর্শী—ব্রাহ্মণীর বিদায়-রহস্যকে এমনভাবে বোধহয় কেহই দেখেন নাই।

ঠাকুর নিতান্ত উদাসীন ভাবেই কামারপুকুরে আসিয়া উপস্থিত

হইলেন। ঠাকুরের দিব্য ভাব পল্লীরমণীগণের চক্ষেও ধরা পড়িয়াছিল; ঠাকুর যে মীন হইয়া সচ্চিদানন্দসাগরে সাঁতার দিতেছেন, এ কথা পল্লীরমণীর মুখ দিয়াই বাহির হইয়াছিল। যাহা হউক, আট বৎসর পরে ঠাকুর প্রকৃতিস্থ হইয়া স্বীয় জন্মভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইলে, সকলে পরামর্শ করিয়া শ্রীশ্রীসারদাদেবীকে পিত্রালয় হইতে লইয়া আসিবার জন্য লোক প্রেরণ করিল। ঠাকুরের ইহাতে আপত্তি ছিল না। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী স্বামী-সন্নিধানে আসিলেন—দীর্ঘ আট বৎসরের চিন্তা কল্পনা কত কি যে হৃদয়ের পরতে গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? ঠাকুরের মনে পড়িল—অদ্বৈত-ব্রহ্মবাদী শ্রীমৎ তোতাপুরী তাঁহাকে বিবাহিত জানিয়াও সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষা দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই! গুরু মুখেই ঠাকুর শুনিয়াছিলেন—"স্ত্রী নিকটে থাকিলেও, যাহার ত্যাগ, বৈরাগ্য, বিবেক, বিজ্ঞান সর্ব্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ থাকে, সেই ব্যক্তিই ব্রহ্মে যথার্থ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্ত্রী ও পুরুষের উভয়কেই যিনি সমভাবে আত্মা বলিয়া সর্ব্বক্ষণ দৃষ্টি ও তদনুরূপ ব্যবহার করিতে পারেন, তাঁহারই যথার্থ ব্রহ্ম-বিজ্ঞান লাভ হইয়াছে। স্ত্রী-পুরুষে ভেদ-দৃষ্টিসম্পন্ন অপর সকলে সাধক হইলেও, ব্রহ্মবিজ্ঞান হইতে এখনও বহুদূরে রহিয়াছে।" (পৃঃ ৩৩৫, সাধকভাব, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ) ঠাকুরের আত্মসংশয় ছিল না; ইহা ব্যতীত, সমাধির মধ্যেও তিনি মুক্ত জীবনের ধারা হারাইয়া ফেলেন নাই। সবখানিই যাঁর ইষ্টময় হইয়াছে, হৃদয়-প্রকাশের ক্ষেত্র ইষ্ট ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু হইবে, এরূপ আশঙ্কাও তাঁহার হইল না; বরং এই অপার্থিব হৃদয়ের ক্ষেত্রস্বরূপ করিয়া পত্নীকে গড়িয়া তুলিবার সৃষ্টি-শক্তি তাঁর মধ্যে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিল। ঠাকুরের নির্ম্মাণ-যজ্ঞের ইহাই প্রথম আহুতি। এইখানেই ব্রাহ্মণীর মাথায় বজ্রাঘাত

হইল, তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। ঠাকুর পত্নীর প্রতি অপার্থিব অনুরাগ যতই প্রদর্শন করেন, ব্রাহ্মণী ততই বিরক্ত হইয়া উঠেন; ঠাকুরের হৃদয়প্রকাশের ক্ষেত্র যতই উজ্জ্বল হয়, অপূর্ণ কামনা অন্তরে রাখার দায়ে ব্রাহ্মণীর দিব্যদৃষ্টি ততই মলিন হইয়া পড়ে—ক্রমে ঠাকুরের প্রতি অনাস্থাপ্রদর্শনেও তাঁর কুণ্ঠা হয় নাই। যাঁহাকে তিনি ভগবানের অবতার বলিয়া হৃদয়ে স্থান দিয়াছিলেন, পত্নীর প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিতে দেখিয়া তিনি প্রকাশ করিয়াই বলিয়া ফেলিলেন—"সে আবার বলিবে কি? তাহার চক্ষুদান তো আমিই করিয়াছি!" হায় অহমিকা! বাসনার বিন্দু আশ্রয় করিয়া, তুমি অতি-বড় জ্ঞানবান্ ব্যক্তিকেও বিনাশের পথে লইয়া যাও। ব্রাহ্মণী শ্রদ্ধাহীন হইয়া ঠাকুরের আশ্রয় হইতে ধীরে-ধীরে অপসারিত হইতে লাগিলেন; সামান্য ঘটনা উপলক্ষ করিয়া তিনি লোকের নিকট হইতেও শ্রদ্ধা হারাইলেন। ব্রাহ্মণী আঘাতে-আঘাতে বুঝিলেন—কোথায় ভুল হইয়াছে এবং নিজের ত্রুটি বুঝিয়া, লুপ্ত শ্রদ্ধাকে পুনঃ জাগ্রৎ করিয়া, চক্ষের জলে ভক্তির অর্ঘ্য সাজাইলেন। একদিন ঠাকুরের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া তিনি চিরবিদায় লইলেন। ব্রাহ্মণীর বিসর্জ্জনে দেবীর প্রতিষ্ঠা হইল—রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের ইহাই পরম ভিত্তি।

* *
*

॥ ১৩ ॥

ভৈরবী চির বিদায় লইলেন। শুনা যায়, ঠাকুরের সহিত তাঁহার কাশীতে আর একবার সাক্ষাৎকার হয়। ঠাকুরের সহিত তিনি বৃন্দাবন-ধামে গিয়াছিলেন, ঠাকুরের নির্দ্দেশেই তথায় বাস করেন এবং এইখানেই তাঁর নশ্বরদেহ ত্যাগ হয়।

কামারপুকুরে এই সময়ে ঠাকুর সাত মাস অবস্থান করেন। তিনি শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণীর সহিত একত্র বাস করিয়া, তাঁর হৃদয়ে প্রণয়-ঘট স্থাপন করেন। শ্রীমৎ সারদানন্দ বলেন—এই কালে শ্রীমার বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর মাত্র ছিল ; ইহা নারীর যৌবন-যুগ হইলেও, পল্লী-অঞ্চলে এই বয়সে যৌবন-লক্ষণ প্রকাশিত হয় না, শ্রীমাও একান্ত বালিকা ছিলেন। কিন্তু যৌবনবিকাশের সন্ধিক্ষণে, এই সাত মাসের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর যে পবিত্র সম্বন্ধ তাহা উভয়ের মধ্যে সংস্থাপিত হয়। ঠাকুরের অপার্থিব অনুরাগ-স্পর্শে শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী নবীন অনুভূতি লাভ করেন। ঠাকুর কামারপুকুর ত্যাগ করিয়া পুনঃ দক্ষিণেশ্বরে প্রস্থান করিলে, তাঁর হৃদয় শূন্য হইয়া পড়ে। যে চারি বৎসর ঠাকুর নিঃসঙ্গ হইয়া, কখন দক্ষিণেশ্বরে, কখন বা তীর্থভ্রমণে অতিবাহিত করিয়াছিলেন, সেই চারি বৎসর তিনি ঠাকুরের বিরহে কিরূপ কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা তাঁহার কলিকাতা যাত্রার প্রস্তাব হইতেই বুঝা যায়।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে মাতাঠাকুরাণী স্বেচ্ছায় পিতার সহিত দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হন। ইহা অনুরাগের আকর্ষণ। পথে আসিতে-

আসিতে তিনি পীড়িতা হইয়া পড়েন এবং পীড়িত অবস্থাতেই অকস্মাৎ একদিন রাত্রিকালে পিতার সহিত ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলেন।

ঠাকুর যেমন সাধনান্তে একান্ত উদাসীনভাবেই কামারপুকুরে গিয়াছিলেন এবং শ্রীমাকে অযাচিতভাবে পাইয়া জীবনের সত্যনিরূপণে উদ্যত হইয়াছিলেন, সেইরূপ একান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে স্বীয় পত্নীকে নিকটে পাইয়া তিনি স্বকর্ত্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হইলেন না, দ্বিধাহীন হইয়া নিজগৃহে স্থান দিয়া স্বতন্ত্র শয্যায় তাঁহার শয়নের ব্যবস্থা করিলেন।

বালিকার অন্তরে, কামারপুকুরে যে প্রণয়-বীজ সঞ্চারিত হইয়াছিল, নানা জনের কথায় ও সংসারক্ষেত্রের আবিলতায় তাহা একান্তভাবে নির্ম্মূল না হইলেও, মাঝে মাঝে সংশয়ের ছায়ায় তাহা মলিন হইয়া পড়িত। তাঁর প্রতি ঠাকুরের যে অপার্থিব অনুরাগ তিনি অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা জীবনের সবখানি সত্য দিয়াই তিনি বরণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু যখন শুনিতেন—তাঁহার স্বামীর কোনই ঠিক-ঠিকানা নাই, তিনি বদ্ধ উন্মাদ, তখন মনে হইত—তবে কি যে নিত্য সম্বন্ধের বীজ তাঁর মধ্যে অঙ্কুরিত, তাহা কল্পনা, মিথ্যা ; ঠাকুর কি তাঁহাকে ছলনা করিয়াছেন ! এই সংশয় মাঝে-মাঝে হৃদয়ে মোচড় দিয়া অধিক যন্ত্রণা দিত। তাহার কারণ, কামারপুকুর হইতে ঠাকুর কলিকাতা প্রত্যাগমন করিলেন, শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণীও স্বামীর নিকট হইতে সম্বন্ধ-তত্ত্বের বস্তুতন্ত্র নিদর্শন লইয়া পিত্রালয়ে আগমন করেন এবং তাঁর নিশ্চয় ধারণা ছিল—ঠাকুর তাঁহাকে শীঘ্রই ডাকিয়া লইবেন। যুবতী পত্নী স্বামীর প্রথম অনুরাগ কি আকুল হৃদয় লইয়াই গ্রহণ করে, তাহা ব্যক্ত করিবার নহে। মাতাঠাকুরাণীর নিকট তাহার অন্যথা হয় নাই ; কিন্তু একটির পর একটি, যখন চারিটি বৎসর অতিবাহিত হইল, তখন প্রতীক্ষার বাঁধ ভাঙ্গিয়া পড়িল ! তিনি দোলপূর্ণিমায় গঙ্গাস্নানযাত্রীদের

সহিত কলিকাতা-দর্শনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। পিতৃদেব কন্যার মনোভাব অবগত হইয়া আপত্তি করিলেন না, স্বয়ং কন্যাকে দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছাইয়া দিলেন।

এই সময়ে ঠাকুরের ভক্ত মথুরবাবু পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি জীবিত থাকিলে এই অবস্থায় মাতাঠাকুরাণীর অধিক সুবিধা হইত, ঠাকুর এই কথাও ব্যক্ত করিলেন। শ্রীমার প্রতি অনুরাগ-প্রদর্শনের ইহা সহজ অভিব্যক্তি। ক্রটি কিছু হইল না—চিকিৎসা, ঔষধ পথ্য দিয়া তাঁহাকে শীঘ্রই নিরাময় করিয়া তিনি নহবৎখানায় স্থান দিলেন এবং রাত্রিকালে নিজের শয্যায় তাঁহাকে শয়নের অধিকার দিয়া সাধনার যাহা বাকী ছিল, তাহা সমাপন করিলেন।

এই ক্ষেত্রে একটি বিষয় ভাবিবার আছে। ঠাকুরের জীবন-সাধনার সত্য মর্ম্মই ইহা দ্বারা অনুভূত হইবে। ঠাকুর প্রকৃতিসিদ্ধ হইয়াছিলেন ; পুরুষভাব বিসর্জ্জন না দিলে তাঁহার ইষ্টস্বরূপ যে লক্ষ্য, তাহা সম্যক্ লাভ করা হয় না; অতএব ঠাকুরের পৌরুষবর্জ্জিত হওয়া বিস্ময়ের কথা নহে। এই অবস্থায় শ্রীমার সহিত এক বৎসর অবস্থান বিচিত্র নহে। যাহাদের মন-মুখ এক নহে, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র ; ঠাকুরের সাধনায় প্রবঞ্চনার স্থান ছিল না। অতএব এই যুক্তি একান্ত উপেক্ষার নহে।

যে ভাব মানুষ সাধে, সেই ভাব তাহার সিদ্ধ হয়। ভাবসিদ্ধ ঠাকুরের নিকট নারীপুরুষ-ভেদ রহিত হওয়ায়, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে যে প্রাকৃত সম্বন্ধ তাহার অভাব হইয়াছিল। ইহাই যদি হয়, তবে ঠাকুরের পক্ষে কোন কথা না থাকিলেও, শ্রীমার প্রতি অবিচার করার অভিযোগ উপস্থিত হয়। এই অবস্থায়, ঠাকুরকে কাণ্ডজ্ঞানহীন উন্মাদ বলিতে হয় ; কেন-না, তিনি নারীজীবনের যে সার্থকতা তাহা

হইতে একজনকে বঞ্চিত করিয়াছেন। অপরের নিকট ইহা আলোচ্য ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যাঁহার দিকে লক্ষ্য করিয়া এই বিষয়ের আলোচনা, তিনি যে সর্ব্বানন্দময়ী হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার প্রত্যক্ষ জীবন সাক্ষ্য দেয়। অতএব ঠাকুরের আচরণ অনেক ক্ষেত্রে দুর্ব্বোধ্য বলিয়া এইরূপ আলোচনা অসার ও ভিত্তিহীন।

জীব আশ্রয়মাত্র, শক্তি আধেয়। এই শক্তি চিদ্রূপা। শক্তিলাভ না হইলে যেমন সত্যের সন্ধান হয় না; অন্যপক্ষে সতে যুক্তি না পাইলেও, শক্তির পরিচয় মিলে না। সাধনার এই দুইটি ভঙ্গী আছে। এই দুই ভঙ্গীই সিদ্ধ। অনেকের মতে, শক্তিসাধনায় সাধক অখণ্ড সত্যে গিয়া পৌঁছে না। কেন-না, শক্তি প্রবৃত্তিময়ী, কাজেই "বহুধা বিশ্বতোমুখী" ; কিন্তু ইহা আমাদের মনের দিক্ হইতে না দেখিয়া, উপরের দিক্ হইতে দেখিলে, ইহার যথার্থ অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইবে। এই প্রবৃত্তি অথবা ইচ্ছাশক্তি কুণ্ডলিনী বা ওজস্ ; ইহাকে আশ্রয় করিয়া তুরীয় ক্ষেত্রে উপনীত হওয়া সাধ্য হইলেও, অসম্ভব নহে। "উল্‌ট জলে মছ্‌লী চলে", কিন্তু "বহি যায় গজরাজ"—তবে আশ্রয় করার কৌশল জানিতে হয়। ঠাকুরের আশ্রয়নিষ্ঠার পরিচয় নূতন করিয়া দিতে হইবে না। আশ্রয় ও আশ্রিত বস্তু এক করিয়াই তাঁর ইষ্টশক্তি নিঃশেষ হয় নাই, তাঁহাকে তৃতীয় স্থানের সন্ধান দিয়াছেন—সমাধিযোগের ভিতর দিয়া ইচ্ছাময়ের সহিত তাঁর চেতনা সংযুক্ত হওয়ার বিবরণ আমরা পূর্ব্বেই ব্যক্ত করিয়াছি। এক্ষণে তাঁর জীবনে যাহা ঘটিবার কথা, তাহা এই সর্ব্বনিয়ন্তার ইচ্ছায় সংসিদ্ধ হইবে। এই অবস্থায়, ঠাকুর যদি গৃহধর্ম্মের আচরণ করিতেন, তাহাও যে দিব্য হইত না, তাহা নহে ; কিন্তু সে ইচ্ছা যখন জাগিল না, তখন যুগের নির্দ্দেশ যাহা, তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়।

তিনি ঊর্দ্ধাশ্রমের সঙ্কেত দিলেন, কিন্তু পালন করিলেন—সন্ন্যাস। তিনি বেদাতীত অবস্থার কথা ব্যক্ত করিলেন, কিন্তু প্রতিষ্ঠা করিলেন—বেদান্ত। তিনি সিদ্ধযোগের মর্ম্মসঙ্গীত গাহিলেন, কিন্তু দীক্ষা দিলেন—আত্মসমর্পণের। তিনি ব্রহ্মচর্য্যাতীত পরমানন্দের অক্ষয় বীজ ছড়াইলেন, কিন্তু আচার করিলেন—ব্রহ্মচর্য্য। ইহা কি তাঁর অক্ষমতা ?—না।

ইহাই ঈশ্বরবিধান। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, ভবিষ্য কল্প তাঁহার নখদর্পণে প্রতিফলিত হইল, জীবের অধিকার যাহা, তাহার অধিক এক পাও অগ্রসর হইলেন না। সম্পূর্ণ নিরহঙ্কার না হইলে, নূতন কিছু করার ঝোঁক যে তাঁহাকে পাইয়া বসিত এবং আত্মবিধান লঙ্ঘন করিয়া অভিনব সৃষ্টির নামে অনাচারকেই তিনি প্রশ্রয় দিতেন, ইহা অবধারিত। ঈশ্বর যাহা চাহেন তাহাই আনন্দ, তাহাই বেদ, তাহাই সৃষ্টি।

ঠাকুরকে শ্রীমতী জিজ্ঞাসা করিলেন "আমায় তোমার কি মনে হয় ?" একটি দীর্ঘ বৎসর শ্রীমতী ঠাকুরের সহিত এক শয্যায় নিশি যাপন করিয়াছেন ; কত প্রেম, কত ভাব তিনি অনুভব করিয়াছেন। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে ভোগসম্বন্ধ, সেকথা যে তাঁর নিকট একেবারেই অবিদিত ছিল, এরূপ অসঙ্গত কল্পনা করার কোন প্রয়োজন নাই। তিনি ঠাকুরের সেরূপ প্রাকৃত বিকার কোনদিন দেখেন নাই, কাজেই অবলার মুখে এই প্রশ্ন সরল ভাবেই বাহির হইয়াছিল। ঠাকুরও অম্লান মুখে উত্তর দিলেন—"যে মা মন্দিরে আছেন, তিনিই এই শরীরের জন্ম দিয়াছেন ও সম্প্রতি নহবতে বাস করিতেছেন এবং তিনিই এখন আমার পদসেবা করিতেছেন। সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর রূপ বলিয়া তোমাকে সর্ব্বদা সত্য-সত্য দেখিতে পাই।"

স্ত্রী—স্বামীর হৃদয়। যতদিন এই অভেদ মিলনের অভাব, ততদিন সংস্কার-রাক্ষসীর তাড়নায়, রক্তমাংসের বিক্ষোভ জীবন অস্থির করিয়া

তুলে। স্বামী ও স্ত্রীর সম্বন্ধ সমস্ত দেহভোগের মধ্যেই নিবদ্ধ নহে ; এমন কি নারীপুরুষের মিলন ক্ষেত্রে ইহা পশুসংস্কারবিশিষ্ট মানবসমাজের বৃত্তিরূপেই হয়তো একদিন পরিগণিত হইবে। উন্নত জীবনক্ষেত্রে এই অনিত্য ভোগস্পৃহা একান্ত গৌণবোধেই উপস্থিত হইবে। দাম্পত্যের এই উদ্দেশ্য—তুইটি পরস্পরবিরুদ্ধ তত্ত্বের অন্তর-বিনিময়। পুরুষের সহিত নারীর অচ্ছেদ্য সম্বন্ধনির্ণয় ভোগে নহে ; বরং ইহা অন্তরায়স্বরূপ মনে হইবে। আত্মার সহিত আত্মার সম্মিলন-পথে দেহের সহিত দেহের মিলনাকাঙ্ক্ষা অন্তরের এই নিগূঢ় আকর্ষণের বিকৃত প্রকাশ। বিকৃতিকে আশ্রয় করিলে, জীবনের সবখানিই অবিশুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়। এই যে পবিত্র দাম্পত্যপ্রণয়, ইহার মধ্যে এই পাপ প্রবেশ করিয়া আমাদের জীবনকে চিরযন্ত্রণাময় করিয়াছে। দাম্পত্যপ্রণয়ের যে মাধুর্য্য, যে সৌন্দর্য্য, যে সত্য, তাহা হারাইয়া, স্বামিস্ত্রীর নিত্য অপার্থিব মিলন ব্যবহারিক জগতের ভোগজীবনে পর্য্যবসিত হইয়াছে—ইহা সহজে পরিহার্য্য নহে। ব্যষ্টিজীবন সিদ্ধ করিবার জন্য যুগ-যুগের আয়োজনে দাম্পত্য-প্রণয়ের অনাবিল মূর্ত্তিরচনারও সাধনা আছে। দক্ষিণেশ্বরেই ইহার প্রথম সূচনা। ঠাকুর তাই বলিয়াছেন, "আমি যদি ষোল টাং করি, তোরা এক টাং করিবি।" অর্থাৎ আমি যে ছাঁচ গড়িয়া চলিলাম, ভবিষ্যতের মানুষ এই আদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বড় জোর সংযত জীবনটুকু লাভ করিবে, বর্ত্তমান দেশে ইহাই যথেষ্ট।

কিন্তু সাধনার সংবেগ সকলের সমান নহে। "মৃদুমধ্যাধিমাত্র-ত্বাত্ততোঽপি বিশেষঃ"—যাহাদের তীব্র সংবেগ, তাহারা ষোল টাং করিতেই চাহিবে। সুতরাং ঠাকুর দাম্পত্যজীবনের যে নবপর্য্যায় গড়িলেন, তাহার অনুসরণ ভবিষ্য জাতির পক্ষে খুবই স্বাভাবিক।

এইরূপ দাম্পত্যজীবনের প্রয়োজন অসিদ্ধ মনে করিয়া, অনেকেই হয়তো ইহার প্রতিবাদ করিবেন ; কিন্তু আসল কথা হইতেছে যে, ঈশ্বর-যুক্তি ধরিয়া জীবের দিব্যজন্মলাভের পথে এই স্তর অনিবার্য্য।

লয় ও সৃষ্টি, এই দুইটিই দিব্য গতি। লয়ের পথে ব্যষ্টি উপাধি সমষ্টিভূত হইয়া প্রকাশাভাব হয়। এই সমষ্টিচৈতন্য কারণ-শরীর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সহজ দৃষ্টান্ত দিয়া কথাটা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। যেমন আকাশ যদি জলাশয়গত হয়, তবে এই আকাশ জলে আশ্রিত এবং জলগত, আকাশের ইহা অবতরণ ; কিন্তু এই যে জলগত আকাশ ও জল, উভয়ে অপরিচ্ছিন্ন তুরীয় আকাশ সেই দুইয়েরই আশ্রয়। এক্ষণে জল ও আকাশ, উভয়ই কূটস্থ হইয়া তুরীয়ে লীন হইতে পারে, ইহাও যেমন সিদ্ধ, তেমনি অন্য দিক্ দিয়া উহাদের প্রকাশ কেন নিত্যসিদ্ধ হইবে না ?

ঠাকুর গুটাইয়া তুরীয়ে সব উঠাইলেন। তারপর যুক্ত-চৈতন্যে নামিতে গিয়া যখন হৃদয় গড়িলেন, তখনই দাম্পত্যজীবন অভিব্যক্ত হইল। তারপর বিশুদ্ধ প্রাণের প্রকাশ সম্ভাবনায় প্রশ্ন উঠিল—"মন, ইহারই নাম স্ত্রী-শরীর, লোকে ইহাকে পরম উপাদেয় ভোগ্য বস্তু বলিয়া জানে, এবং ভোগ করিবার জন্য সর্ব্বক্ষণ লালায়িত হয় ; কিন্তু উহা গ্রহণ করিলে, দেহেই আবদ্ধ থাকিতে হয়, সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না। পেটে একখানা, মুখে একখানা করিও না, সত্য বল—তুমি উহা গ্রহণ করিতে চাও, অথবা ঈশ্বরকে চাও ? যদি উহা চাও ত এই তোমার সম্মুখে, গ্রহণ কর।" (পৃঃ ৩৭৭, সাধকভাব, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ)

সম্মুখে অষ্টাদশবর্ষীয়া যুবতী পত্নী, পুরুষের যৌবনযুগে এখনও যবনিকা পড়ে নাই, ঠাকুরের ভক্তগণ তখনও তাঁহাকে ঘিরিয়া

আদর্শের শীলমোহর আঁটিয়া লয় নাই, বৈধী ও সামাজিক নিয়মে যথাবিহিত বিবাহবন্ধনে উভয়ে বদ্ধ, এ ভোগ কোন কারণেই দূষণীয় নহে। ভাগবতপ্রীতিপরায়ণ নারীপুরুষের এই মিলন সংসারে খুবই বিরল, ঠাকুর সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন। প্রাণকে উদ্যত করিলেন—দুই বাহু উঠাইয়া সেই অশেষ সৌন্দর্য্যময়ী স্বর্ণপ্রতিমাকে বুকে ধরিয়া, এক চুমুকে যৌবন-সুধা-পানের উদ্যোগ করিলেন, কিন্তু চেতনা নামিল কৈ? এক নিমিষে কে যেন জীবনের বিদ্যুৎশক্তি তুরীয়ে উঠাইয়া লইল, তাঁহার বহিশ্চৈতন্য একেবারে লুপ্ত হইল। সে রাত্রির কথা শ্রীমা ভিন্ন আর কে বলিবে? কিন্তু তার পরদিনও ঠাকুর বেহুঁস ছিলেন, অনেক কষ্টে তাঁহার চৈতন্যসম্পাদন হইয়াছিল।

ইহা ত আদর্শের দায় নহে! ইহা ত কৃচ্ছ্র সাধ্য তপস্যা নহে! ভগবানের চাওয়া যাহাকে পায়, একদিকে যেমন "মায়য়াপহৃতজ্ঞানম্" হইয়া আসুর ভাব মানুষের ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে অবশ করিয়া স্বকার্য্য সাধিয়া লয়, অন্যদিকেও এই একই কথা—সর্ব্বনিয়ন্ত্রী ভগবতীশক্তিকে যে আশ্রয় করে, তাহার "যোগক্ষেম" স্বয়ং ভগবান্‌ই বহন করেন।

ঠাকুর দেখিলেন—ঈশ্বরচৈতন্য কোথায় আসিয়া বিমুখ হইল, জীবশুদ্ধির কোন্ স্তর এখনও আবিলতাময় এবং তাহার শোধনের উপায় কি! তিনি তখন কাজ পাইলেন—যে তত্ত্ব-বস্তু দিয়া নূতন ভারত-গঠনের ভবিষ্যদ্বাণী যুগ-যুগান্তর ধরিয়া আকাশে কেবল মহাধ্বনির ঝঙ্কার তুলে, তাহা সিদ্ধ করার অব্যর্থ সঙ্কেত জাতিকে দিবার জন্য উন্মাদ হইলেন। সেই আকুল উন্মাদনার রূপপরিণতিই রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ। সে কথা পরে বলিতেছি।

* * *

॥ ১৪ ॥

এক বৎসরের অধিক কাল ঠাকুর শ্রীমার সহিত একত্র দক্ষিণেশ্বরে বাস করিলেন। এই সময়ে তিনি তাঁহাকে নিজের শয্যাসঙ্গিনী করিয়া লইয়াছিলেন। এই এক বৎসরের অধিক কাল, পরিণীতা ভার্য্যার সহিত একত্র এক শয্যায় রাত্রিযাপন করিয়া তিনি বুঝিলেন—তাঁর চেতনা উচ্চভূমি হইতে অবতরণ করিয়া, দেহ ও ইন্দ্রিয়ভোগাদিতে রত হইতে চাহে না। যতই দিন যাইতে লাগিল, আত্মপরীক্ষায় নিজের ভবিষ্যৎ ততই উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি আপনার বিষয়ে নিঃসংশয় হইলেন। তিনি বুঝিলেন—ইষ্টের ইচ্ছাই জয়যুক্ত হইবে। জীবের বাসনা শ্রীশ্রীজগদম্বার ইচ্ছার সহিত সংযুক্ত নহে; আজ লীলার ক্ষেত্রে ভগবানের ভোগমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে তপস্যার মূর্ত্তি প্রকট হইয়া উঠিল—তিনি যুগের সত্যপ্রচারে উদ্বুদ্ধ হইলেন।

নিজের যোগ্যতা সম্বন্ধে নিশ্চয়তা পাইয়াই তিনি অনুপ্রাণিত হইলেন না। স্বীয় পত্নীর অবস্থার প্রতি তাঁর লক্ষ্য ছিল; তাঁহাকে ক্ষুণ্ণ করিয়া আপনার অভীষ্টসিদ্ধির পথ তিনি আবিষ্কার করেন নাই। এইজন্য দীর্ঘ এক বৎসরের উপর শ্রীমাকে সঙ্গে রাখিয়া যুগপৎ উভয়ের ভিতরের অবস্থাই তিনি বুঝিয়া লইলেন। ঠাকুর নিজ মুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন "ও (শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী) যদি এত ভাল না হইত, আত্মহারা হইয়া তখন আমাকে যদি আক্রমণ করিত, তাহা হইলে সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দেহবুদ্ধি আসিত কি না, কে বলিতে পারে? বিবাহের পরে মাকে (জগদম্বাকে) ব্যাকুল হইয়া ধরিয়াছিলাম যে,

মা, আমার পত্নীর ভিতর হইতে কামভাব এককালে দূর করিয়া দে ; ওর (শ্রীশ্রীমার) সঙ্গে একত্র বাস করিয়া এই কালে বুঝিয়াছিলাম, মা সে কথা সত্য-সত্যই শ্রবণ করিয়াছিলেন।" (পৃঃ ৩৭৯, সাধকভাব, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ)

পূর্ব্ব হইতেই ঠাকুরের এইরূপ সতর্কতা দেখিয়া কাহারও মনে হইতে পারে, যে দিন পত্নীর সহিত কিরূপ আচরণ করিবেন, তাহার একটা আদর্শ নিজের মধ্যে গড়িয়া লইয়াছিলেন এবং দীর্ঘ দিনের সিদ্ধ সংযমশক্তি প্রয়োগ করিয়া সেই আদর্শসিদ্ধির জন্য উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহার মূলে কোন সত্যই দেখা যায় না ; কেন-না, ঠাকুর যন্ত্র-চালিত শিশুর ন্যায় শ্রীশ্রীজগদম্বার হস্তে চালিত হইতেন। শ্রীশ্রীজগদম্বার সঙ্কেতেই তিনি বিবাহ করেন, তন্ত্র-সহজিয়ায় সিদ্ধ হন, বেদান্তের দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীজগদম্বার ইচ্ছা নিজেদের দেহপূর্ত্তির আকাঙ্ক্ষায় ও প্রাণের উদ্দাম বাসনায় যাহাতে প্রতিহত না হয়, ইহা অবিকৃতভাবে উপলব্ধি করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। ভগবান্ যাহা চাহেন, তাহাই যদি আমরা হইতে পারি, তাহা হইলে সৃষ্টি সার্থক হয়। জীব-শক্তির সহিত স্বরূপশক্তির যে দ্বন্দ্ব, তাহাই বর্ত্তমান সংস্কার ; এই নীতি চিরযুগ অসিদ্ধই থাকিবে, এইরূপ ধারণা যাঁহাদের বদ্ধমূল এবং সংসার অসার বলিয়া যাঁহারা ইহবিমুখ হন, ঠাকুর এইরূপ বিরক্ত সন্ন্যাসীর শ্রেণীভুক্ত ছিলেন না। তিনি চাহিয়াছিলেন—দেহবুদ্ধির স্বতন্ত্র চেতনা হারাইয়া অখণ্ড ভাগবত চেতনায় সর্ব্বাঙ্গ গড়িয়া তুলিতে। এই আদর্শকে তিনি জোর করিয়া রূপ দিতে চাহেন নাই ; ইহা ইষ্টের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়াছিলেন। সে ইচ্ছার প্রকৃষ্ট মর্ম্ম যুবতী পত্নীকে সঙ্গে লইয়া বুঝিলেন—বুঝিলেন—ভাগবত চৈতন্য স্বাধিষ্ঠান-ক্ষেত্রে রাজ্য বিস্তার করিতে এখনও প্রস্তুত নহে। ইহা ঠাকুরের আধার

অপকৃষ্ট বলিয়া নহে; তিনি বেদান্তের অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্বের আস্বাদ করিয়াছিলেন, সর্ব্বভূতাত্মা হইয়াছিলেন। নিখিল জীবদেহের সহিত আপনার যুক্তি মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মরণ হন নাই, তাই তিনি আত্মমুক্তির বন্ধন হইতে মুক্ত ছিলেন। জীবের বর্ত্তমান অবস্থায় এখনও যে শোধনের সাধনা বাকী আছে এবং ইহা সুসিদ্ধ না হইলে ভারতের সত্য জীবনক্ষেত্রে বিশুদ্ধ মূর্ত্তিতে যে প্রকাশ পাইবে না, এই জাগ্রৎ প্রেরণাই তিনি মায়ের সঙ্কেতে হৃদয়ঙ্গম করিলেন। এই সন্ধিক্ষণেই তাঁহার সাধনযজ্ঞে পূর্ণাহুতি পড়িল—ঠাকুরের দাম্পত্যসাধনের ইহাই শেষ অঙ্ক।

দীর্ঘদিনের সাধনায় তাঁর প্রমাথী ইন্দ্রিয়বৃত্তি শ্রীশ্রীজগদম্বার ইচ্ছা-বিরোধী হওয়ার সামর্থ্য হারাইয়াছিল। তিনি ইন্দ্রিয়জয়ী হইয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীমা পল্লীজীবনের ক্ষেত্রে এমন কি সাধনা করিলেন, যাহার প্রভাবে তিনিও স্বামীর অভীষ্টসাধনে একমুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করিলেন না? ঠাকুরের প্রার্থনাশক্তির প্রভাবেই শ্রীমা প্রস্তুত হইয়া উঠিলেন? অথবা ঠাকুরের সাধনচিত্র যেমন করিয়া তদীয় ভক্তবৃন্দ আঁকিয়া তুলিয়াছেন, শ্রীমার সাধনকথা আমাদের নিকট তেমন করিয়া কেহ চিত্রিত করেন নাই, এইজন্য তাঁরও কঠোর তপস্যার কথা আমরা অবিদিত; যদিও পরবর্ত্তী যুগে শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণীর কথা সামান্য কিছু জানিতে পারি, কিন্তু তাহা দক্ষিণেশ্বরে দাম্পত্যজীবনের পরম পরিণামের পর ঘটিয়াছিল। ঠাকুর গভীর রাত্রে ঘর হইতে নহবৎখানার দিকে যাইতেন, ইহা দেখিয়া সংশয়ী মন তাঁহার অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হইবে, ইহা কিছু বিচিত্র কথা নহে; কিন্তু যখন ইহা দেখা গেল যে, তিনি একান্তে বিল্ববৃক্ষমূলে অথবা পঞ্চবটী-তলে বসিয়া গভীর সমাধিমগ্ন হইতেছেন এবং শ্রীমাও

তখন নহবৎখানায় একান্তে বসিয়া উচ্চভূমিতে চেতনাকে উঠাইয়া স্থির নিঃস্পন্দ হইয়া স্বামীর সহিত তুরীয়ক্ষেত্রে পরমানন্দ ভোগ করিতেছেন, তখন ঠাকুরের মতই তাঁহাকেও অসাধারণ শক্তিসম্পন্না দেবীমূর্ত্তি ভিন্ন অন্য কিছু মনে হয় না। কিন্তু এই অপার্থিব অধিকার আয়ত্ত করার জন্য তাঁর জীবনসাধনার তো কোন পরিচয় পাই না!

মহৎ ও বৃহৎ জীবনের অধিকারলাভের জন্য আমরা প্রত্যেকের জীবনেই একটা সাধন-যুগের আভাস পাই। এই হিসাবে শ্রীমার এইরূপ তপস্যার যুগ কি প্রকারে অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহা জানিবার জন্য ঔৎসুক্য জন্মে। ঠাকুরের সহিত কামারপুকুরে কয়েক মাস একত্র থাকিয়া অন্তরে প্রণয়-ঘটস্থাপন ও ঠাকুরের মধুর উপদেশাবলী লাভ করিয়া তাঁর পুনঃ পিত্রালয়ে প্রত্যাবর্ত্তনকাল হইতে দক্ষিণেশ্বরে পুনরাগমন পর্য্যন্ত এই চারি বৎসর তাঁর জীবনের সাধন-যুগ বলা যাইতে পারে। এই চারি বৎসরে তিনি যে অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহারই উপর ভর করিয়া, সমস্ত ভবিষ্যৎ অটল ভিত্তির উপর গড়িয়া উঠিল। এই হেতু এই চারি বৎসরের কথা একটু আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

ঠাকুরের সঙ্গ পাইয়া শ্রীমার পূর্ব্বচরিত্র নূতন পরিগ্রহ করে। শ্রীমৎ সারদানন্দ মহারাজের কথায় বলিতে হয়—"...তাঁহার চলন, বলন, আচরণাদি সকল চেষ্টার ভিতর এমন একটি পরিবর্ত্তন যে উপস্থিত হইয়াছিল, এ কথা আমরা বেশ বুঝতে পারি......উহা (ঠাকুরের সঙ্গ) তাঁহাকে চপলা না করিয়া শান্তস্বভাবা করিয়াছিল, প্রগল্ভা না করিয়া চিন্তাশীলা করিয়াছিল, এবং অন্তর হইতে সর্ব্বপ্রকার অভাববোধ তিরোহিত করিয়া মানবসাধারণের দুঃখ-কষ্টের সহিত অনন্ত সমবেদনা-সম্পন্না করিয়া ক্রমে তাঁহাকে করুণার সাক্ষাৎ

প্রতিমায় পরিণত করিয়াছিল। মানসিক উল্লাসপ্রভাবে অশেষ শরীর-কষ্টকে তাঁহার এখন হইতে কষ্ট বলিয়াই মনে হইত না; বরং আদর-যত্নের প্রতিদান না পাইলে মনে দুঃখ উপস্থিত হইত না।" (পৃঃ ৩৬৯, সাধকভাব, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ)—আত্মানন্দের মাত্রা তখনও পরিপূর্ণ হয় নাই, তাই সব কিছু ছাড়িয়া একটা বাসনা তাঁহাকে নাচাইয়া তুলিত; উহা পুনঃ মিলনের আকুলতা। চারি বৎসর এই দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষাকে তিনি বুকে চাপিয়া রাখিলেন, কিন্তু হৃদয় আর মানা মানিল না—তিনি উন্মাদিনীবেশে একদিন দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্বামীর ধর্ম্ম আত্ম-ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করার জন্যই তিনি এই চারি বৎসরে প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ঠাকুরের সহিত প্রথম পরিচয়েই যে মন্ত্রলাভ করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার মর্ম্ম বিশুদ্ধ করিয়াছিল। সে মন্ত্রের মর্ম্ম বুঝিবার অবকাশ হয় নাই, মন্ত্রজ্ঞান ধ্যানে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ পাইয়াছিল। ধ্যান পরিপক্ক হইলেই দর্শনের আকুলতা জাগে, দর্শনে স্পর্শের আকুলতায় চিত্ত উন্মত্ত হয়—ঠাকুরের সান্নিধ্যে চক্ষুঃ-কর্ণের দ্বন্দ্ব মিটিল; তবুও হৃদয় যে সবখানি দিয়া ইষ্টমূর্ত্তির সবখানিকেই জড়াইয়া ধরিতে চায়, পরন্তু এ মূর্ত্তি যে ধরা দেয় না! তাই বোধ হয়, একদিন তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"আমায় তোমার কি মনে হয়?" যে উত্তর শুনিলেন, সে উত্তরে আর তাঁর ক্ষোভ রহিল না, তিনি বুঝিলেন—'জনম-জনম হাম রূপ নেহারিনু।' নয়ন যেখানে তৃপ্ত হইবার নহে, সেখানে দর্শনের-স্পর্শনের অন্য কৌশল আছে। সারা এক বৎসর ধরিয়া ঠাকুরের অপার করুণায় সে কৌশল তিনি আয়ত্ত করিলেন। তাই ঠাকুর যখন সচ্চিদানন্দ সাগরে সাঁতার দিতেন, শ্রীমাও তাঁর সঙ্গে সাঁতার দিতে সারারাত্রি

একান্তে বসিয়া কাটাইতেন—মিলনের এ স্বর্গীয় মাধুর্য্য, এ অপূর্ব্ব আস্বাদ ভোগকাতর জীবের বুদ্ধিগম্য হইবার নহে। পত্নীর প্রতি পতির-দিব্য আচরণ আজিও দুর্ল্লভ বস্তু। পুরুষজীবনের সমগ্র সিদ্ধি মন্ত্রদানের মুহূর্ত্তটুকুর মধ্যে নারীর হৃদয়ে কেমন করিয়া ঢালিয়া দিতে হয়, ঠাকুরের দাম্পত্যলীলায় তাহা পরিস্ফুট হইয়াছে। ঠাকুরের সবখানি জীবনমর্ম্ম কামারপুকুর হইতেই তিনি অঙ্কুররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। পিত্রালয়ে শ্রদ্ধা-নিষ্ঠা ভক্তিসিঞ্চনে যে প্রেমতরু সঞ্জীবিত হয়, দক্ষিণেশ্বরে তাহা ফলে-ফুলে শোভিত হইয়া বিশ্বজনের চিত্ত চমৎকৃত করে—কেবল তাহাই নহে, জীবনসাধনায় অমরত্ব-লাভের অব্যর্থ সঙ্কেত দিয়া উহা মানব জীবনের পরম সার্থকতার সিদ্ধ পথ প্রদর্শনও করিয়াছে।

নারী—বিশ্বপ্রকৃতির প্রতীক। পুরুষের প্রথম আবির্ভাব এই প্রকৃতিকে ঈক্ষণ করিয়া, পুরুষ তখন প্রকৃতির নিয়ন্তা। তারপর পুরুষের প্রকট আবির্ভাব প্রকৃতিগত হইয়া, পুরুষ তখনই বিশ্বনাথ। পুরুষের তৃতীয় প্রকাশ ব্যষ্টিজীবনের ঈশ্বরত্ব লইয়া। সৃষ্টির আদিতেই পুরুষ আত্মপ্রকৃতির সহিত সংযুক্ত হইয়াছেন, এই যুক্তি পুরুষের ইচ্ছাকে রূপ দিবার জন্য। পরিণয়ের মধ্যে এই সনাতন নীতি আজিও শক্তিহীন নয়; সত্যকে আমরা দেখি না, দৃষ্টি অন্ধ বলিয়া। এই অন্ধত্বের মূল—তামসিকতা, মোহ, ভোগকামনা। ইহা হইতে মুক্তি পাইলেই, চিরদিনের সত্যই আবিষ্কৃত হয়। সত্যকে গড়িতে হয় না, পাইতে হয় না—সত্যের আবরণ অপসারিত হয়। ইষ্টনিষ্ঠায়, ঠাকুর শুদ্ধ সত্ত্বময় হইয়াছিলেন, তাঁর আত্ম-প্রকৃতিকে বাছিয়া লওয়ায় প্রমাদ ঘটে না; প্রকৃতিগত হইতে গিয়াই পত্নীর অন্তরে আপনার সবখানি সত্য এক মুহূর্ত্তে প্রদান করিতে তিনি সমর্থ হইয়াছিলেন—নিজ দেহের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে

গিয়া দেখিলেন, যে চেতনায় ব্যষ্টিশরীর আপনার ঈশ্বরত্ব ঘোষণা করিবে, তাহার সবখানি ভাগবতময় হওয়ার শুভক্ষণ এখনও আসে নাই। এই ক্ষেত্রে মনে রাখিতে হইবে, ঠাকুরের ইহা অক্ষমতা নহে। ভাগবত তত্ত্ব জীবোদ্ধারেই অবতরণ করে, জীবের অধিকার এই ইচ্ছায় নিয়মিত হয়। ঠাকুরের মহত্ত্ব সীমা ছাড়াইয়া এইখানেই অনির্ব্বচনীয় মহিমামণ্ডিত হইয়াছে যে, তিনি সে ইচ্ছার দ্যোতনায়, আত্মচৈতন্যের স্বাতন্ত্র্য সম্যক্ প্রকারে ডুবাইয়া দিয়া যুগধর্ম্মের আবিষ্কার করিলেন; ব্যক্তিগত সিদ্ধিকে জাতিগত তপস্যায় যুক্ত করিলেন—যেদিন তাঁর আত্মসাধনা শেষ হইল, সেদিন সিদ্ধ ভারত-গঠনের অমর মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন।

১২৮০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস—মায়াতন্ত্রে জ্যৈষ্ঠ মাসের অমাবস্যার মধ্যরাত্রে মহেশ্বরীপূজাবিধি কথিত আছে, উহাই ফলহারিণী কালীপূজা। ঠাকুর আত্মস্থ হইয়া এই রাত্রে ব্রত উদযাপন করিলেন। তাঁহার মানস-প্রতিমা আর পাষাণময়ী জড়মূর্ত্তি ধরিয়া অতীতকে প্রশ্রয় দিল না, মানুষকেই ঈশ্বরের আসন দিল—জড়ের বিসর্জ্জন হইল, পাষাণময়ী দেবী জীবন্ত চিন্ময়ী মূর্ত্তিতে দেখা দিলেন।

মন্দিরে আজ উৎসব। শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজায় আজ ঠাকুর উদ্বুদ্ধ হইলেন না, তাঁর শয্যাগৃহেই পূজার আয়োজন করা হইল। অনুষ্ঠান শেষ করিতে তাঁর এক প্রহর অতিবাহিত হইল। তিনি শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণীকে পূজাকালে উপস্থিত হইতে আদেশ করিয়াছিলেন, তাঁর বসিবার জন্য পূজাবেদীও গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি বিচিত্র-আলিপনা দিয়া একখানি পীঁড়ি তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে স্থাপন করিয়াছিলেন, মাতাঠাকুরাণীকে সাদরে সেই আসনে উপবেশন করিতে সঙ্কেত দিয়া পূজায় বসিলেন।

পূজার মন্ত্র গৃহে ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলিল। শ্রীমা পূজার বিধান দেখিয়া আত্মহারা হইলেন। মন্ত্রের ছন্দে তাঁর হৃদয় তালে-তালে নাচিয়া উঠিল। ঠাকুরের কণ্ঠে কোন্ জগৎ হইতে মন্ত্রধ্বনি উঠে কে জানে! তাঁর বাহ্যচৈতন্য লুপ্তপ্রায়। ঠাকুর ফল, ফুল, নৈবেদ্য, ধূপ, দীপ, সবই যে তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া উৎসর্গ করেন, ঘটের পূত সলিলে তাঁরই অঙ্গাভিষেক হয়, পূজার মাল্য তাঁর কণ্ঠেই শোভা পায়—আবেশবিভোর হইয়া তিনিও চেতনা হারাইলেন। পতিপত্নী আজ সমাধিমগ্ন। যে দেহ, প্রাণ, মন মন্দিরের মূর্ত্তি আশ্রয় করিয়া নিবেদিত হইয়াছিল, সে দেহ, প্রাণ, মনের আজ উৎসর্গ নহে—জাগ্রৎ ইষ্টমূর্ত্তির সহিত লীন হইয়া মিলনের মধু আস্বাদে উভয়ের চিত্ত উভয়কে আলিঙ্গন করিয়া পূর্ণভাবে মিলিত হইল। মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত আপনা-আপনি বহিয়া চলে, বাহিরের আঁধার যোট পাকাইয়া ঘরে উঁকি মারে, ঘৃতপ্রদীপ জ্বলিয়া শেষ হয়—প্রকৃতির অবাধ লীলার মাঝে এই অপার্থিব মিলনের বেদীপ্রতিষ্ঠা হইল। বুঝি প্রভাতের আলো এই অপূর্ব্ব রহস্যদর্শনে আজ দ্রুতগামী—ঠাকুর আত্মস্থ হইলেন, জীবনের অনির্ব্বচনীয় সাধনার সকল ফল অঞ্জলী করিয়া দেবীর পদমূলে অর্পণ করিলেন; নিত্য জপের মালা সেদিন মহাসাধকের করচ্যুত হইয়া দেবীর পদবন্দনা করিয়া মুক্তি পাইল; অনন্তযুগের জন্য ভারতের সাধনপাশ ছিন্ন করিয়া ঠাকুরের আত্মনিবেদন সফল মূর্ত্তিতে সেদিন ভারতকে ধন্য করিল। তাঁর কণ্ঠে গদগদ মন্ত্রধ্বনি উদ্গান তুলিল :—

"সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোস্তুতে ॥"

ঠাকুরের সাধনা শেষ হইল। ভারতের আত্মনিবেদন-যজ্ঞ তিনটী

বস্তুর উৎসর্গের উপর নির্ভর করে—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম—এই ত্রয়ী সাধনায় জলাঞ্জলি দিলেই মোক্ষ করতলগত হয়। এই মোক্ষ—ধর্ম্ম হইতে মুক্তি, অর্থ হইতে মুক্তি, কাম হইতে মুক্তি। এই মুক্তি-মন্ত্র ঠাকুর উচ্চারণ করিলেন। জীবনসাধনার সকল ফল ইষ্টের চরণে নিবেদন করিয়া, তিনি ভারতকে ধর্ম্মপাশ হইতে মুক্তি দিয়াছেন। অর্থ ও কামের নাগপাশ হইতে মুক্তি পাইলে জাতি দিব্য হয়, তাই কামকাঞ্চনত্যাগের মন্ত্রে তিনি জাতিকে দীক্ষা দিলেন। ঠাকুরের দাম্পত্যজীবনের পরিণামে আত্মনিবেদনের সিদ্ধ সাধনাই প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে; কিন্তু জাতি অন্ধ, এ মোহ বুঝি এখনও ঘুচিবার নয়! এই মহাযজ্ঞের মর্ম্মরহস্য সাধ্যমত উপসংহারে ব্যক্ত করিব।

* *
*

॥ ১৫ ॥

ঠাকুরের বিবাহ-কাল হইতে তাঁহার পত্নীর সহিত সম্বন্ধান্তর পর্য্যন্ত দ্বাদশ বর্ষের সাধনার পরিচয়টুকু যথাসাধ্য দিবার চেষ্টা করিয়াছি। জাতীয় জীবন-সমস্যা অধ্যাত্মানুশীলনসাপেক্ষ যদি হয়, তাহা হইলে ইহা হইতেই আমরা অব্যর্থ নির্দ্দেশ পাইব।

হিন্দুধর্ম্মের মূল কথা কোটী-কোটী হিন্দু নরনারীর নিকট চিরদিন অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে। ইহার কারণ, তত্ত্ব-মর্ম্ম উপলব্ধি করার জন্য যে কঠোর তপস্যা, যে সংযম ও নিত্য বৈরাগ্যের আশ্রয় লইতে হয়, তাহা সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে। সকলের প্রবৃত্তিও এক প্রকার হয় না; কাজেই এক শ্রেণীর মানুষই ইহা সাধিয়া যায়। সাধনার ফল সকলের মধ্যে সঞ্চারিত হয়; কিন্তু সে ফল অধিকারি-ভেদে বিকৃত আকার প্রাপ্ত হয়। অনেক ক্ষেত্রে ফলের অপেক্ষা সাধনা-কাণ্ডেই অধিক ঝোঁক দেখা যায়; লক্ষ্য সম্বন্ধে জ্ঞান নাই, পঞ্চবটীতলে আসন পাতিয়া বসিতে পারিলেই অনেকে কৃতার্থ মনে করে। হিন্দুসমাজের মনীষিবর্গ এই হেতু বিধিব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করেন। নীতি পালন করিয়া ধর্ম্মলাভের ব্যবস্থা ছিল, অধিকারি-ভেদ নির্ণয় করিতে গিয়া চরিত্র-বৈচিত্র্যবশে শাস্ত্রসিন্ধু গড়িয়া উঠে। এখন এমন দাঁড়াইয়াছে যে, হিন্দুধর্ম্ম একপ্রকার স্বেচ্ছাচারের ক্ষেত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, প্রত্যেকের আচরণ শাস্ত্রসঙ্গত বলিয়া প্রমাণ করা দুঃসাধ্য নহে।

সনাতন ভারতের ধর্ম্মবিধি, নীতি ও ব্যবস্থার অনুগত নহে।

তুমি অধিকারীই হও আর অনধিকারীই হও, সত্যকে সত্য দিয়াই লাভ করিতে হয়—কামনাপূর্ত্তির জন্য শাস্ত্রের আশ্রয় লওয়ার রীতি কু-রীতি বলিতে হইবে। তেত্রিশ কোটী দেবতা গড়িয়া গৃহস্থের দৈনন্দিন জীবনের সুবিধাবিধানের জন্য পূজা দেওয়ার ব্যবস্থা অথবা রিরংসাবৃত্তির চরিতার্থতা সাধনার অঙ্গ বলিয়া শাস্ত্রবাক্য রচনা করা কত বড় দুর্নীতি, তাহা সত্যের একনিষ্ঠ উপাসক ভিন্ন অন্যে বুঝিবেন না। উদ্গারে খাদ্যবস্তুর গন্ধই বাহির হয়, শাস্ত্র-বুদ্ধি নিষ্কাম আধার না হইলে বিকৃত যুক্তির অবতারণা করে—দেশের এমন অনেক প্রসিদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ আবর্জ্জনা-ক্ষেত্রে নিক্ষিপ্ত হইবে।

ঠাকুরও পৌত্তলিকতা আশ্রয় করিয়াছেন, কিন্তু আত্মকাম-সিদ্ধির জন্য নহে—নিষ্ঠা-রক্ষার উপায়রূপে। সাধনার গোড়ায় চাই যে নিষ্ঠার সাধনা! বিনা আশ্রয়ে নিষ্ঠার ভাব ঘন হয় না। যে শ্রদ্ধায় জ্ঞান-লাভ হয়, তাহার অব্যর্থ বীর্য্যই নিষ্ঠা। যেখানে কামনা, সেখানে নিষ্ঠা স্থির হয় না। ঠাকুরের মত করিয়া পৌত্তলিকতার পূজা যদি কোথাও সিদ্ধ হয়, সত্যকেই আবিষ্কার করা হইবে; কিন্তু হিন্দুর মন্দিরে দেবতার প্রতিষ্ঠা নিষ্ঠা-সাধনের অঙ্গরূপে যে বর্ত্তমানে প্রতিষ্ঠা পায়, এরূপ মনে না করা বোধহয় অন্যায় হইবে না। ঠাকুর সুরধুনী-তীর পুণ্যক্ষেত্র-রূপে সন্দর্শন করিয়া অন্তরবাহ্য বিশুদ্ধ রাখিতেন, গঙ্গাবারি তাঁর নিকট সতত ব্রহ্মবারি বলিয়া অনুভূত হইত। পূর্ব্বদিনে হিন্দু নর-নারীও গঙ্গাস্নান করে, সে প্রত্যয়ের আগুন কয়জনের বুকে জ্বলে—তাহা নিজ-নিজ অন্তর বিচার করিয়া দেখিলেই বুঝিবার সুবিধা হইবে। গঙ্গাস্নান করিলেই পুণ্য হয় না, অন্তরে শ্রদ্ধার বন্যা বহিলে তবেই জাহ্নবীধারা অমৃত-স্পর্শ দেয়; মৃত্তিকাপ্রস্তর করুণার নির্ঝর ঝরায় না, রুগ্ন পতি-পুত্রের প্রাণ দান

করে না, আদালতে মকদ্দমায় জয় পরাজয় ঘটায় না। মরণ বাঁটিয়া যে দেবতায় জীয়ায়, সেই পায় নবজন্ম। সে নবজন্মের লক্ষণ শ্রুতির এই প্রার্থনা-মন্ত্রে পাওয়া যায়ঃ

"অসতো মা সদ্গময়।
তমসো মা জ্যোতির্গময়।
মৃত্যোর্মা অমৃতংগময়।"

ঠাকুর এই পথে যাত্রা করিয়াছিলেন এবং ইহা জীবন দিয়া সিদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহা না হইলে সর্ব্বত্যাগী সিদ্ধ সন্ন্যাসী হইয়া কে বজ্রকণ্ঠে বলিতে পারে—"আমার মুক্তি নাই, শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব আমি, জীবকল্যাণহেতু যুগে-যুগে আমায় অবতীর্ণ হইতে হইবে।"

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রও এই কথাই বলিয়াছিলেন—শ্রীগৌরাঙ্গও মুক্তি-মোক্ষের মায়াব্যূহ ভেদ করিয়া ইহার প্রতিধ্বনি তুলিয়াছিলেনঃ

"সার্ষ্টি-সারূপ্য আর সামীপ্য-সালোক্য।
সাযুজ্য না পায় ভক্ত যাতে ব্রহ্ম-ঐক্য॥
যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তাইনু নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
চারিভাব ভক্তি দিয়া নাচাইনু ভুবন॥"

রামপ্রসাদও গাহিয়াছেনঃ

"বেদবাক্য নিরাকার ভজনে কৈবল্য।
সে কথা না ভাল শুনি বুদ্ধির তারল্য॥
প্রসাদ বলে, কালরূপে সদা মন ধায়।
যেমন রুচি তেমনি কর, নির্ব্বাণ কে চায়॥"

এই সব ভাবের অভিব্যক্তি দেখিয়া মনে হয়, বাংলার অধ্যাত্ম-সাধনার গতি জীবনকে ঋতময় করিয়া অবস্থান্তর আনিবারই প্রয়াস করিয়াছিল; পরন্তু জীবন হইতে চেতনাকে মুক্তি দিতে চাহে নাই।

সাধনার উদ্দেশ্য ইহাই। ধর্ম্মের লক্ষ্য ঐহিকও নয়, পারত্রিকও নয়; তাই বলিয়া যে ইহা মোক্ষ ও নির্ব্বাণরূপ একটা তুরীয় অবস্থা, ইহা কষ্ট-কল্পনা। সেই অনাগত অভাবনীয় নবজন্মগ্রহণের তপস্যা বাংলায় যেমন ধারাবাহিক রূপে সিদ্ধ হইতে চলিয়াছে, এমন পূর্ণাঙ্গ সাধনার রূপ আর কোথাও দেখা যায় না। আমরা নান্নুরে সাধ্য-নিরূপণের জন্য যে তপস্যা মূর্ত্ত হইতে দেখি, নবদ্বীপে তাহা সিদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়া বাঙ্গালীকে সাধন-সম্পদে পূর্ণ করিয়াছে; আবার হালিসহরে সর্ব্বঘটে ব্রহ্মময়ীকে দেখার জন্য যে আকুল কণ্ঠ বাংলার আকাশ-বাতাস মুখরিত করিল, দক্ষিণেশ্বরে সে ভাবঘন রূপ আবির্ভূত হওয়ায় জাতি ধন্য হইল। যাহা প্রয়োজন, তাহার সাধন ও সিদ্ধি হাত-ধরাধরি করিয়া কালের ছন্দে তাল দিয়া চলিয়াছে; সুতরাং বাংলার অধ্যাত্মসাধনা তো আর সমস্যাপূর্ণ নহে। এক্ষণে চাই যে বস্তুর প্রাপ্তি-হেতু এতখানি উদ্যোগ, এতখানি তপস্যা, তাহা আয়ত্ত করিয়া সৃষ্টিকে সফল করা। এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থান্তর জীবনের সিদ্ধি নয়; ইহার মূলে যে সত্য রূপ আছে, তাহাতে সর্ব্বাবস্থায় সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিধান আমরা ঠাকুরের জীবন হইতে অনায়াসে লাভ করিতে পারি।

আমাদের একটা কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যে পথটুকু ঠাকুর জাতিকে পার করিয়া দিলেন, তাহার পরও গতি আছে; কেবল আবর্ত্তের ঘূর্ণিপাক হইতে আমরা মুক্তি পাইয়াছি। সদ্-বিগ্রহ রূপ, চিৎ গুণময়ী; রূপ যখন গুণে-লয় হয়, তখনই জীবের অধ্যাত্মাবস্থা। ইহা যে আদৌ চরম কথা নয়, তাহা ঠাকুরের কথা দিয়াই বুঝিব:

"অদ্বৈতভাব শেষ কথা জান্‌বি, উহা বাক্য-মনের অতীত উপলব্ধির বিষয়।"

বাক্য-মনের বাহিরেও উপলব্ধির ক্ষেত্র আছে। কিন্তু আমরা সেখানে গিয়া ফিরিয়া আসি নাই; কাজেই অধ্যাত্মগতির একটা অবস্থাই হইয়াছে সাধনার লক্ষ্য। সে অবস্থা বিদীর্ণ করিয়া ভারতের সত্যে জাতিকে যদি নূতন জন্ম লইতে হয়, তাহা হইলে এখনও একটা তপস্যা আছে। তবে সে তপস্যা বস্তু-নির্ণয়ের অন্বেষণ নহে; যাহা প্রাপ্ত, তাহাকে প্রকাশ করারই সাধনা। সত্যের প্রাপ্তি-বোধ "আপূর্য্যমাণ অচলপ্রতিষ্ঠ" স্বভাবের লক্ষণ। জীবের সহিত ভগবানের যোগাযোগ যে প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে সম্পন্ন হয়, তাহা ঠাকুরের জীবন দিয়া যদি সিদ্ধ হইয়া থাকে, আমরা "ততঃ কিম্" বলিয়া আগাইব—যেখানে আসিয়া তিনি আমাদের ছাড়িয়াছিলেন, সেইখান হইতেই আবার যাত্রা আরম্ভ করিব।

চণ্ডীদাসের সাধ্য ছিল প্রেম, নবদ্বীপে তাহার সিদ্ধ রূপ পাইয়াছি। অতএব বাংলার প্রেম আর সাধ্য নহে, সিদ্ধবস্তু; অতএব ইহার প্রাপ্তিবোধ না হওয়াই বিচিত্র। হালিসহরে শক্তির সন্ধান আরম্ভ হইয়াছিল; দক্ষিণেশ্বরে ব্রহ্মময়ীর বিগ্রহমূর্ত্তি চক্ষুঃ-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিয়াছে। বাঙ্গালী তাই সিদ্ধ প্রেম ও শক্তির অধিকারী। বাংলায় জ্ঞানঘন মূর্ত্তি এখনও গড়ে নাই, তবে দক্ষিণেশ্বরেই ইহারও বীর্য্যস্থাপন হয়। আজ বিজ্ঞানময় মহাশিবের আরাধনা চলিয়াছে—যেদিন অতীতের প্রেম ও শক্তির মত এ তত্ত্বও জীবনে তার "চিন্ময় নাম, চিন্ময় ধাম, চিন্ময় শ্যাম" মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবে, বাংলার ত্রয়ী-সাধনা সিদ্ধ হইবে। অসংখ্য জটিলতা ভেদ করিয়া এই যে সাধনার জাহ্নবীধারা তাহার রোধ হইবে না; ভারতের সনাতন শিবময় স্বরূপ প্রকৃতির বাধায় বিকৃত আকার ধরিবে না, বিশুদ্ধ বেশে জাতিকেই ধন্য করিবে।

হিন্দুর যোগ-দর্শনেই একটা সঙ্কেতবচন আছে। "জাত্যন্তর-পরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ"—এক জাতি হইতে অন্য জাতি, এইরূপ যে পরিণাম, অর্থাৎ তির্য্যক্ জাতি হইতে নর-সুর-আকারে যে পরিণতি তাহা প্রকৃতির আপূরণেই সম্ভবপর হয়।

প্রকৃতির পরিণাম—পুরুষের ইচ্ছায়। প্রকৃতি এই ইচ্ছাকে প্রকৃষ্ট রূপ দেয় তখনই, যখন আত্মস্থা হয়। আত্মস্থা হইলেই রমণ প্রেরণা জাগে। প্রকৃতি গুণসম্পদে চঞ্চলা, ভ্রষ্টবুদ্ধি মায়া; নতুবা রমণের আকাঙ্ক্ষায় একবার গুণের বর্জ্জন, আবার গ্রহণ, এই দুই নীতি ভিন্ন তৃতীয় পন্থা তার কাছে স্ফুটতর নয় কেন? শক্তির এই দু'-নয়ন ব্যতীত তৃতীয় চক্ষুঃ আছে—যখন সে দৃষ্টি ঢাকা, তখন জীবনমরণ খেলায় সে প্রমত্তা; তৃতীয় নয়ন উন্মীলিত হইলেই ভোগ ও ত্যাগের বাহিরে গিয়া সে দাঁড়ায়। ভগবানের চাওয়া সিদ্ধ করার এই অবস্থাই ঠাকুরের জীবনে সফল হইয়াছে। এই দানই দক্ষিণেশ্বরের মহাদান। এই মহাতীর্থের পুণ্যধূলি শিরে উঠাইয়া আবার যদি সাধ্যনির্ণয়ের সাধনায় জাতিকে শঙ্করযুগ প্রবর্ত্তন করিতে হয়, আবার যদি সহজিয়া-তন্ত্রের সাধনায় মানুষ মজিতে চায়, তবে সে মৃত জাতি প্রেতের ন্যায় নৃত্য করুক। দীক্ষিত তরুণের সম্মুখে যে অনন্ত ভবিষ্যৎ তাহা কেবল দিবারাত্রি, পক্ষ, মাস, ঋতু, সম্বৎসর লইয়া কালের প্রবাহ নহে; উহা একটা অখণ্ড পরমায়ুঃ। এখানে নির্ব্বাণ নাই, মুক্তি নাই, মোক্ষ নাই; আছে "সব রস-সার শৃঙ্গার এ"—সে শৃঙ্গার-রসের সর্ব্বোত্তম রসিক আপনি মজিয়া জগৎ মজাইবার রসায়ণ দিয়াছেন। জীবনগড়ার এই অমৃত আমরা কি ব্যবহার-দোষে ব্যর্থ করিব?

বাংলার বৈষ্ণব ও তন্ত্রসাধনা রূপকে চিতে ডুবাইয়া বিশুদ্ধ

করিতে চাহিয়াছে, লয় চাহে নাই। এ-রূপে সে-রূপে এক করিয়া যে সিদ্ধ জীবন, তাহা মনে সাধিয়া পাওয়ার বস্তু নহে, জীবন দিয়াই সাধিতে হয়। নবদ্বীপচন্দ্র তাই প্রেম সাধিতে গিয়া প্রেমস্বরূপ হইলেন, ঠাকুর রামকৃষ্ণ ব্রহ্মময়ীতে জীবন ডুবাইয়া—কালীময় হইলেন এ নীতি ছাড়িয়া সতের বিগ্রহ গ্রহণ সম্ভবপর নহে। কথাটা ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য, আমরা বাঙ্গালী সাধক চণ্ডীদাসের কথাই প্রথম উদ্ধৃত করি :

"মানুষ মানুষ ত্রিবিধ মানুষ
মানুষ বাছিয়া লহ ;
সহজ মানুষ অযোনি মানুষ
মানুষ সংস্কার-দেহ।

সংস্কার যেই ব্রহ্মাণ্ডতে সেই
সামান্য তাহার নাম ;
মরণে জীবনে করে গতাগতি
ক্ষীরোদ-সায়রে ধাম।

গোলক উপরে অযোনি মানুষ
নিত্য স্থানে সদা রয়।
তাহার প্রকাশ বৈকুণ্ঠের পতি
লীলা-কায়া যেবা হয়।

তাহার উপরে নিত্য বৃন্দাবনে
সহজ মানুষ জানে ;
আনন্দে ঘটনে রহে দুই জনে
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে।"

একটু অনুধাবন করিলে, গীতায় লোকত্রয় প্রকাশের হেতু যে পুরুষোত্তম-বাদ তাহার ইহা উৎকৃষ্ট বিবরণ বলিয়া গ্রহণ করা যায়।

"দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কুটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥"

ক্ষর ও অক্ষর, দুইটী পুরুষ জগতে প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত সর্ব্বভূত ক্ষর পুরুষ; অক্ষর পুরুষ কূটস্থ চৈতন্যস্বরূপ। এই কূটস্থ চৈতন্যই ভোক্তা। ক্ষর-পুরুষের লয় এই কারণেই হয়। সৃষ্টির বীজ নিত্য, অক্ষরে লীলাবস্থা নির্ব্বাণ বলিয়া গণ্য হয়। ইহার উপরেও—

"উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥"

এই ক্ষর ও অক্ষরপুরুষ হইতে পৃথক্ উত্তম পুরুষ পরমাত্মা নির্ব্বিকার হইয়াও সর্ব্বজ্ঞ নারায়ণরূপে লোকত্রয়ে প্রবেশপূর্ব্বক "বিভর্ত্তি" অর্থাৎ পালন করিতেছেন। এই পালনশক্তি-বিশিষ্ট চৈতন্য-প্রযুক্ত, বাংলার সিদ্ধ কবি পরমপুরুষ সহজ মানুষের কল্পনা করিয়া নিত্য বৃন্দাবনে দুইজনে আনন্দ সৃষ্টি করার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

মানুষের রূপান্তর বা নবজন্ম-বাদ, এই অনুভূতির সাধনা ধরিয়া বাংলায় সিদ্ধ হইতে চাহিয়াছে। "মানুষ সংস্কার-দেহ"—সে ক্ষর; জীবন-মরণের মধ্যেই ইহার গতাগতি। ইহার সামান্য নাম। কিন্তু মূলে পুরুষোত্তমের বীজ বর্ত্তমান—তাই তো সংস্কারমোচন হইলে, এই দেহেই দেহান্তর অসিদ্ধ নহে।

ইহার সাধনা যে পথ ধরিয়াই হউক, এই লীলাদেহের যে কারণ-জগৎ, তাহা উদ্ভিন্ন করিতেই হইবে। খণ্ডচেতনা মরণের ছন্দেই ঘটে। কিন্তু উহা সেই আনন্দময় সত্তারই লীলা-দ্যোতনা; তাই মায়া বলিয়া

উহা উড়াইবার বস্তু নহে, এই অনুভূতি বুদ্ধিগ্রাহ্য করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে, মনুষ্যদেহ লইয়া অনন্ত যুগের যে প্রক্রিয়া চলিয়াছে, সিদ্ধ দেহ গড়ার যে মূল প্রেরণা জ্ঞানে-অজ্ঞানে মানুষের চিত্তে অভাবনীয় ভাবোদয় ঘটাইতেছে, তাহার সত্য হৃদয়ঙ্গম হয় না। প্রকৃতির আপূরণদ্বারা রূপান্তর হওয়ার কথা মনোহর কল্পনা বলিয়াই ধরিয়া লইতে হয়।

কিন্তু ভারতের সত্তা সহস্র প্রকার বিপত্তি ও চিত্তবিভ্রান্তকারী যুক্তি গ্রাহ্য না করিয়া, নিরন্তর ধারায় জাত্যন্তরের সাধনায় উদ্‌বুদ্ধ হইয়াছে। এই যে শরীর, ইহার উপাদান পঞ্চভূত; কিন্তু এই একই পঞ্চভূত কীট, সরীসৃপ হইতে সুগঠিত মনুষ্য-মূর্ত্তি পর্য্যন্ত গড়িয়া তুলিয়াছে। একই বুদ্ধিসত্তা দিয়া জীবমাত্রের মনের গঠন; সেই বুদ্ধি-তত্ত্বের পরিণতি মানব-প্রধান যাঁহারা, তাঁহাদের মধ্যে কি উন্নততর পরিণত মূর্ত্তিতে প্রকাশমান, তাহা সত্যই বিস্ময়কর। প্রকৃতির এই সাধা কিছু দূর গিয়া শেষ বলিয়া মনে হয়। মানুষের সত্তা এইখানেই বিদ্রোহ করে; প্রকৃতির প্রতিকূলাচরণ করিয়া তাহার সাধ্যকে জাগাইয়া, সে কারণ-জগতে প্রবেশ করে। কেবল জীবতত্ত্বের ক্ষরাক্ষর অবস্থা নহে, প্রত্যেক বস্তুর এই দ্বিবিধ পরিণাম আছে। প্রেম বস্তু তখনই, যখন ইহা আশ্রয়াবলম্বনে অনুভূত হয়। আশ্রয়চ্যুত হইলে, কারণ হইতেই ইহা চুঁড়িয়া বাহির করিতে হয়; সেইখানেই ইহার মৌলিক রূপ মিলে। তাই বাঙ্গালীকে সাধ্যবস্তুর নিত্যবীর্য্যলাভের জন্য দীর্ঘ যুগ সাধনা করিতে হইয়াছে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের জীবনে আমরা সামান্য হইতে বিশেষ ও বিশেষ হইতে সহজকে সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিতে দেখি। এই সহজই গীতার পুরুষোত্তম। যেখানে নিত্য মরণ আর নিত্য জীবন লইয়া রঙ্গ নহে,

দ্বন্দ্ব যেখানে আপনহারা হইয়া শান্তি ও আনন্দের নিদান হইয়াছে, নিত্য ও অনিত্য প্রবৃত্তি, ত্যাগ ও ভোগ, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম সামঞ্জস্যলাভে প্রশান্ত হয় যে দেহে ও বুদ্ধি-তত্ত্বে, তাহা এ দেহ ও এ বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। জাতির মধ্যেই আর একটি জাতির অভ্যুদয় হওয়ার ইহা সঙ্কেত। ভারতের সাধনা যদি এই সিদ্ধান্ত না করিয়া— নিত্য অবস্থা যাহা তাহাই সত্য, আর অনিত্য অবস্থার উপলব্ধি হইলেই নশ্বর বোধে সৃষ্টিকে গ্রহণ ও বর্জ্জন করার নীতি আশ্রয় করিয়া চলে, তাহা হইলে সৃষ্টিচেতনায় পরমাত্মার প্রকাশ সম্ভবপর হয় না। কিন্তু কি গৃহস্থ, কি সন্ন্যাসী, কি ব্রহ্মচারী সংস্কার-বশে শ্রেয়ঃকে বরণ করিতে না চাহিলেও, পুরুষোত্তমের জাগরণ রুদ্ধ হইবে না। কোটী কোটী যোজনান্তরে নক্ষত্রের জ্যোতিঃ-কণা যেমন দ্রুত ধাবমান, তেমনই জীবের চেতনাঘোর বিদীর্ণ করিয়া পরমাত্মার আহ্বান পৃথিবীর কাণে আসিয়া আজ ঝঙ্কার তুলিয়াছে। ঠাকুর যাহা শেষ করিয়াছেন, তাহার পুনরাবর্ত্তন আমাদের ভবিষ্যৎ নহে। আমাদের ধর্ম্ম আর তন্ত্র নয়, সহজিয়া নয়, এমন কি বেদ পুরাণের সাধনাও নহে। আমরা অতীতকে শ্রদ্ধার চক্ষেই দেখিব; কিন্তু জীবনের সত্য দিয়া আমাদের আবার নূতন বেদ, নূতন শাস্ত্র রচনা করিতে হইবে। এই দেহ নূতন উপাদানসংযোগে, নবভাবে গড়ার যে নীতি, তাহাই আবিষ্কার করিতে হইবে। এই বুদ্ধিসত্তা ইন্দ্রিয়বৃত্তির মূল উপাদান, আরও তীক্ষ্ণ ও শক্তিশালী ইন্দ্রিয়বৃত্তির জন্যই আমাদের ইহারও আমূল পরিবর্ত্তন চাই। আমরা আজ হারাইতে চাহি না কিছুই, চাহিলেও যাহা তত্ত্ব তাহার নাশ হইবার নহে। স্বপ্নকে সত্য ও সত্যকে স্বপ্ন বলিয়া যে মন হাসিয়া উড়ায়, সেই মনের আজ মরণ চাই; উর্দ্ধ হইতে যে গঙ্গোত্রী-ধারা ঝরিয়া পড়ে, মাথা পাতিয়া তাহা

ধরার উদ্যোগে যে মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়ে, তাহার নূতন গঠন চাই। ভারত হইতে মুক্তি ও মোক্ষের আদর্শ ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে মুছিয়া দিতে হইবে। সে আদর্শ—সত্যকে বিশুদ্ধ মূর্ত্তিতে দেখার সাধনা। যাহা সাধনা, তাহা জীবনের লক্ষ্য নহে! ঠাকুরের এই আশীর্ব্বাদ আমরা যেন মাথা পাতিয়া বহিবার যোগ্য হই—তবেই ভারতের সত্য আমাদের নিকট ধরা দিবে।

* *
*

উপসংহার

আর দুই-একটা কথা বলিবার আছে। ইংরাজী ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ঠাকুরের সাধনা শেষ হইল। "মূর্ত্তিমতী বিদ্যারূপিণী মানবীর দেহাবলম্বনে ঈশ্বরীয় উপাসনা-পূর্ব্বক ঠাকুরের সাধনার পরিসমাপ্তি হইল—তাঁহার দেবমানবত্ব সর্ব্বতোভাবে সম্পূর্ণতা লাভ করিল।" (পৃঃ ৩৮২, সাধকভাব, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ) ঠাকুরের সাধনা যে তাঁর নিজের জন্য নহে, জগতের জন্য—এ কথাও তিনি বহুবার প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু সে সাধনার চরম কথা কি, তাহা তাঁর বিপুল জীবনেতিহাস মন্থন করিয়া, সাধারণের নিকট সুবোধ্য হওয়া সহজ নহে। এইজন্য সংক্ষেপে সেই কথাটী ব্যক্ত করিতে পারিলেই ঠাকুরের জীবন লইয়া এই আলোচনা সার্থক হয়।

ভারতের ধর্ম্মজীবনের সুদীর্ঘ ইতিহাস অসংখ্য বিপ্লবের মধ্য দিয়া অতি স্বচ্ছন্দে অবিচ্ছিন্ন ধারা রক্ষা করিয়াছে। আর্য্য-সভ্যতার যুগ হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত ভারতের অধ্যাত্মসাধনার সঙ্গীত অনাহত ঝঙ্কার তুলিয়াছে, কোথাও ছন্দোভঙ্গ হইতে দেখা যায় না। রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর প্রভৃতি মহাপুরুষগণের জীবন যদি সম্প্রদায়গত ভেদ সৃষ্টি না করে, তাহা হইলে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, এক অখণ্ড সত্তাই জগজ্জীবনের ঘোরতর সমস্যার মীমাংসা-হেতু যুগে-যুগে বিভিন্ন মূর্ত্তিতে বিভিন্ন দিগ্‌দর্শনের জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন। অযোধ্যায় রামরাজ্য ব্যর্থ হইল বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ধর্ম্মরাজ্যসংস্থাপনে বিমুখ হন নাই; কুরুক্ষেত্রেরও সেই বিপুল আয়োজন নিষ্ফল হওয়ায়, ভারতের

চেতনায় নূতন সুরের মূর্চ্ছনা উঠে। নিজেকে কেমন করিয়া ফুরাইতে পারিলে, অবিনাশী শাশ্বতকে অবিকৃত আকারে পাওয়া যায়, শাক্যসিংহের জীবন-তপস্যার মর্ম্ম যদি এই ভাবে গৃহীত হয়, তাহা হইলে বৌদ্ধযুগের দান বেদ-বিরুদ্ধ বলিয়া ভারত হইতে বিদায় দেওয়ার প্রয়োজন থাকে না। ভারতের রাজ্য যে বিশুদ্ধ তত্ত্ব দিয়া গড়িয়া তোলার স্বপ্ন বৈদিক যুগের ঋষিরা দেখিয়াছিলেন, তাহার বিরাট্ মূর্ত্তিরচনার প্রেরণা লইয়াই অযোধ্যায় রামচন্দ্র ও বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আবির্ভাব। কামবীজের শোধন সম্ভবপর নহে বলিয়া মধ্যযুগে যে "নেতি"-চিহ্নিত বৈরাগ্যের পতাকা উড়িয়াছিল, কুরু-ক্ষেত্রের পর ইহার রূপান্তর সাধিত হইয়াছিল। সংস্কার-দুষ্ট দৃষ্টি অতীতের রঙেই পরবর্ত্তী যুগকেও দেখিয়াছে। বৌদ্ধযুগের সাধনায় ত্যাগের অগ্নি-গর্ভ-মধ্যেও নব সৃষ্টির বেদীরচনারই উপাদান ছিল। ভারতের ধর্ম্ম ও সৃষ্টি, উভয়ের মাহাত্ম্য এই যুগের পরই জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অযোধ্যার তপস্যা রাক্ষস-নিধন নহে ; ধর্ম্মজীবনের পথে যে মায়াবাদের কুহেলিকা তাহা সংহরণ করিয়া, ভারতের ক্ষাত্রশক্তি সসাগরা ধরার উপর রাজ্যপ্রতিষ্ঠার আয়োজন করিয়াছিল —বশিষ্ঠের শিক্ষা-সাধনার প্রবল যুক্তি খণ্ডন করিয়াই ব্রহ্মের মত জগৎকেও তাহা নিত্য করিতে চাহিয়াছিল। ভারতের এই প্রয়াস অখণ্ড প্রবাহে দক্ষিণেশ্বরে বিগ্রহান্বিত হইয়াছে। ঠাকুর নিজেই এ কথা স্বীকার করিয়াছেন যে, শ্রীশ্রীজগন্মাতা উদ্দেশ্য-বিশেষসাধনের জন্যই এবার তাঁহাকে বাহ্যৈশ্বর্য্যের আড়ম্বরশূন্য করিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণ-কুলে নিরক্ষর করিয়া আনয়ন করিয়াছেন। তিনি বুঝিলেন— "শ্রীশ্রীজগন্মাতার এ লীলা-রহস্য তাঁহার জীবৎকালে স্বল্পলোকেই ধরিতে-বুঝিতে সমর্থ হইবে।" এই উদ্দেশ্য-বিশেষ যে কি, তাহাও

জোর করিয়া যুগের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অনুকূল অর্থে প্রয়োগ করিব না —তাঁহার কথা হইতেই ইহা সপ্রমাণ হইবে। তিনি বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কথা তুলিয়া বলিয়াছেন: "তিনটী বিষয় পালন করিতে যত্নবান্ থাকিতে ঐ মতে উপদেশ করে—নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণবপূজন। যেই নাম, সেই ঈশ্বর—নাম-নামী অভেদ জানিয়া সর্ব্বদা অনুরাগের সহিত নাম করিবে; ভক্ত ও ভগবান্, কৃষ্ণ ও বৈষ্ণব অভেদ জানিয়া সর্ব্বদা সাধু ভক্তদিগকে শ্রদ্ধা, পূজা ও বন্দনা করিবে এবং কৃষ্ণেরই জগৎ-সংসার, এ কথা হৃদয়ে ধারণা করিয়া সর্ব্বজীবে দয়া—" এই কথা বলিয়া সমাধিস্থ হইয়া পরে আবার বলিয়াছেন: "জীবে দয়া, জীবে দয়া?—দূর শালা! কীটানুকীট তুই জীবকে দয়া কর্‌বি? দয়া করবার তুই কে? না, না, জীবে দয়া নয়, শিব-জ্ঞানে জীবের সেবা!" ঠাকুরের এই কথায় তাঁর ভক্তমণ্ডলীর চিত্তে সেদিন যে আভাস ফুটিয়াছিল, তাহাই সত্য··· "বুঝা গেল বনের বেদান্তকে ঘরে আনা যায়, সংসারের সকল কাজে উহাকে অবলম্বন করিতে পারা যায়।" ব্রহ্মানন্দময় জীবন্মুক্ত শুকদেব গোস্বামীকেও আমরা দেখি— সৃষ্টির দরদ লইয়া, ব্যাসদেবের সম্মুখে বসিয়া ভাগবত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে। নিত্যলীলার রসাস্বাদে শুধু গৃহস্থের আশ্রম পবিত্র করার আকুলতায় ভারতের ধর্ম্মপ্রকাশ হয় নাই, আকুমার ব্রহ্মচারী আত্মনিষ্ঠ সন্ন্যাসীকেও ইহাতে বিভোর হইতে হইয়াছে।

ভারতের ভাগ্যবিপর্য্যয়ে ধর্ম্মলোপের সম্ভাবনা হয় নাই, যুগে-যুগে ভারতের অখণ্ড সত্তা মূর্ত্ত হইয়া ইহা রক্ষা করিয়াছেন। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে পাশ্চাত্ত্যের যাদুকরী সভ্যতা এ দেশের চিত্ত অধিকার করিতে শিক্ষার বীজ ছড়াইতে আরম্ভ করে। এখনও শতাব্দী পার হয় নাই, ভারতের শিক্ষা, সভ্যতা ও আদর্শ বিনষ্ট করার জন্য ইহার

মধ্যেই অজস্র ধারায় যে আবর্জ্জনারাশির প্রবাহ সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে ভারতের জ্ঞান যে স্বভাবতঃই আচ্ছন্ন হইবে, ইহা অসম্ভব কথা নহে। এই জন্য এই সন্ধিক্ষণেই ঠাকুর জন্মপরিগ্রহ করেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় সাধনায় সিদ্ধ হইয়া তিনি সনাতন মন্ত্রে ভারতকে দীক্ষা দান করেন। এই মহাদীক্ষার প্রভাব অতিক্রম করিবার শক্তি তথাকথিত পাশ্চাত্ত্যজ্ঞানগর্ব্বিত বিকৃত-চরিত্র জনের পক্ষে আর সম্ভবপর নহে। আজ শিক্ষা, সভ্যতা, সমাজ, ধর্ম্ম, রাষ্ট্র, সবই অভারতীয় প্রথায় প্রবর্ত্তিত হইতে চাহে, অভারতীয় উপাদান আশ্রয় করিয়া ভারতের মূল উপড়াইয়া শ্রদ্ধার বীর্য্য বিনষ্ট করিতে অপূর্ব্ব কৌশল বিস্তার চলিয়াছে; কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে ভারতের যে ভাস্বর রূপ বিকশিত হইয়াছে, তাহার প্রভাব আর অতিক্রম করার নয়। ঠাকুর ইহা নিজেই ব্যক্ত করিয়াছেন, তাঁর তিরোধান ঘটিলে…তাঁর "শরীর-মনের দ্বারা যে প্রবল আধ্যাত্মিক তরঙ্গ জগতে উদিত হইবে, তাহা সর্ব্বতোভাবে অমোঘ থাকিয়া তিনি দেহরক্ষা করিবার পরও অনন্তকাল জনসাধারণের কল্যাণ সাধন করিতে থাকিবে।"

স্বামী সারদানন্দ "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে" এই কথাই ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছেন: "পাশ্চাত্ত্যের বিদ্যা ও সভ্যতার প্রবল তরঙ্গ আসিয়া ভারতের প্রাচীন ব্রহ্মবিদ্যা ও রীতি-নীতি প্রভৃতির যখন আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করিতে বসিল, তখন ভারতের প্রত্যেক মনীষী ব্যক্তি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের শিক্ষা ও ধর্ম্ম প্রভৃতির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আনয়নের জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন।" এই সামঞ্জস্য কথাটী আত্মতত্ত্বে পরিপূর্ণ আস্থার অভাবেই ব্যবহৃত হয়। ঠাকুর ঠিক সামঞ্জস্য চাহেন নাই। স্বামীজী সত্যই বলিয়াছেন: "শ্রীযুক্ত রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশব প্রভৃতি বঙ্গদেশে

যেমন ঐ চেষ্টায় জীবনপাত করিয়াছেন, ভারতের অন্যত্রও সেইরূপ অনেক মহাত্মার ঐরূপ করিবার কথা শ্রুতিগোচর হয়। কিন্তু ঠাকুরের আবির্ভাবের পূর্ব্বে তাঁহাদিগের কেহই ঐ বিষয়ের সম্পূর্ণ সমাধান করিয়া যাইতে পারেন নাই।" ঠাকুর ইহার জন্য কি করিলেন? "নিজ জীবনে ভারতের ধর্ম্মমত-সমূহের সাধনা যথাযথ সম্পন্ন করিয়া এবং উহাদিগের প্রত্যেকের সাফল্য লাভ করিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, ভারতের ধর্ম্ম ভারতের অবনতির কারণ নহে, উহার কারণ অন্যত্র অনুসন্ধান করিতে হইবে—দেখাইলেন যে, ঐ ধর্ম্মের উপর ভিত্তি করিয়াই, ভারতের সমাজ, রীতিনীতি, সভ্যতা প্রভৃতি সকল বিষয় দণ্ডায়মান থাকিয়া প্রাচীনকালে ভারতকে গৌরব পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। এখনও ঐ ধর্ম্মের সেই জীবন্ত-শক্তি রহিয়াছে এবং উহাকে সর্ব্বতোভাবে অবলম্বন করিয়া আমরা সকল বিষয়ে সচেষ্ট হইলে, তবেই সকল বিষয়ে সিদ্ধকাম হইতে পারিব, নতুবা নহে।"

ঠাকুর ভারত-তত্ত্বে এমন আস্থাবান্ হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই ভারতের সনাতন তাঁহাতে বিগ্রহান্বিত হইয়া, সাধনার অনাহত ধারা রক্ষা করিয়াছে। ভারতের ভাব-সাধনায় অভারতীয় প্রথা, অভারতীয় রীতিনীতি, অভারতীয় উপাদান তিনি বিষবৎ জ্ঞান করিয়াছিলেন—ভারতের তত্ত্বকে ভারতীয় প্রথায় তিনিই আবিষ্কার করিয়া তুলিলেন। এই তত্ত্ব জাহ্নবীধারার ন্যায়, ভগীরথের দৃষ্টি ভ্রান্ত করিয়া মধ্যপথে আত্মগোপন করে; তাই ইহাকে বার-বার সনাতন প্রথায় পুনরাবিষ্কার করিতে হয়। পাশ্চাত্ত্য আলোকপাতে বিভ্রান্ত-বুদ্ধি বাংলার মনীষিবৃন্দ সেদিন তত্ত্ব-বস্তুকে আত্মময় করার পথ আশ্রয় করেন নাই; তত্ত্বকে তুরীয় জগতে

রাখিয়াই ভারতের ধর্ম্ম সিদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন—এই ফাঁকে অভারতীয় আদর্শবাদ প্রবেশ করিয়া অমানুষিক শ্রম ও সাধনা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে উভয় পক্ষের বাদপ্রতিবাদের কোলাহল যখন কর্ণপটহ বিদীর্ণ করিয়া দেয়, সেই যুগেই ধর্ম্ম, সমাজ, শিক্ষা, সাধনা, সকল ক্ষেত্রেই বিপ্লবসৃষ্টির কুরুক্ষেত্র কলিকাতা মহানগরীর উপকণ্ঠে বসিয়া জড়-পাষাণ কালীমূর্ত্তির চরণতলে জানু পাতিয়া যিনি আত্ম-নিবেদন করিয়াছিলেন—সেদিন কেহ কল্পনা করিতেও পারে নাই যে, কেশবের অতুল প্রতিভা ও ধর্ম্মমতের প্রভাব ছাড়াইয়া নরেন্দ্রনাথ এই পুরাতন প্রথায় একনিষ্ঠ উপাসক ঠাকুরের চরণেই আত্ম-নিবেদন করিয়া ধন্য হইবেন। ঠাকুর সেইদিন আনন্দে আত্মহারা হইলেন, যেদিন নরেন্দ্র শ্রীশ্রীজগদম্বার চরণে আত্মনিবেদন জানাইয়া অশ্রুবর্ষণ করিলেন; "নরেন কালী মেনেছে রে!" বলিয়া তিনি অতিশয় উৎসাহের সহিত করতালি দিয়া উঠিলেন! নরেন্দ্রকে তিনি পৌত্তলিকতার ফাঁদে আবদ্ধ রাখিতে চাহেন নাই; তিনি চাহিয়াছিলেন ভারতীয় সকল প্রথাকে দরদী চক্ষে দেখার শিক্ষা দিতে। জাতীয়তার প্রতি এমন মমতা যেখানে, সেইখানেই তো সত্য ভারত জলন্ত মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হয়! জগৎ যদি ব্রহ্মের বিগ্রহ হয় আর ভারতের জীবনে সে মূর্ত্তি যদি সিদ্ধ হইয়া থাকে, তবে সে নিত্য লীলার ব্রহ্মাণ্ড ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গেই সেদিন প্রকট হইয়াছিল; একজন অন্তরঙ্গ ভক্ত তাই বুঝি ভক্তিগদগদকণ্ঠে হৃদয়ের অপূর্ব্ব প্রেরণার বশে অবশ হইয়া বলিয়া উঠিয়াছিল "আপনি ভগবান্ সাক্ষাৎ ঈশ্বর!"

ভারতের যুগ-যুগান্তর ধরিয়া এই তত্ত্ব-বস্তুই সিদ্ধদেহে অবতীর্ণ হইতে চাহিয়াছে। এই তত্ত্বের বৃন্দাবন সৃষ্টির স্বপ্নই ভারতের কল্প

স্বপ্ন। ঠাকুর তাই লয় চাহেন নাই, মোক্ষ-নির্ব্বাণ উপেক্ষা করিয়াছিলেন, ইষ্ট-বস্তু কালীতে আপনাকে নিঃশেষে ঢালিয়া ব্রহ্মময়ী কালীময় হইয়াছিলেন। তত্ত্বকে জানা ও পাওয়ার ইহাই সনাতন বিধি। সাধনার যত পথ, সব সাধিয়া তিনি একই ইষ্টে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, ইহাই তাঁহার ইষ্টের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠার পরিচয়। আবার ইষ্টময় হইয়া তিনি ফুরাইয়া যান নাই; কেন-না, সৃষ্টিকে তিনি মিথ্যা বলিয়া উপেক্ষা করেন নাই, তাহা নিত্যবিগ্রহ-বোধে সাধনা করিয়াছেন। তত্ত্ব শুধু তুরীয় নহে, তাহার নিত্য রূপ আছে। তত্ত্বের সহিত রূপের সম্বন্ধ অটল না হওয়ায়, ইহা বারেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে—ভারতের ধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হইতেছে না।

দক্ষিণেশ্বরের সাধনা বিশদ করিয়া বুঝিবার জন্যই বাংলার সাধনতত্ত্বকে ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিতে হয়। কেন-না, ভারতের বৈদিক যুগের সভ্যতা বাঙ্গালী জীবনগত করার জন্য যে অভিনব সাধন-পথ আবিষ্কার করিয়াছে, ঠাকুরের জীবনে তাহার সবখানিই পরিস্ফুট হইয়াছে—সেই সকল কথার পুনরুল্লেখ করিয়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করিব না। ভারতের তত্ত্ব-বস্তু বাঙ্গালীর নিকট আজ আর অসিদ্ধ নহে। বলিয়াছি, তত্ত্বের সঙ্গীত চণ্ডীদাসের কণ্ঠে বাজিয়াই নীরব হয় নাই, প্রেম মূর্ত্তি লইয়া শ্রীচৈতন্যে প্রকাশ পাইয়াছে। এই জন্য তত্ত্বলাভ আজ সহজসাধ্য। শ্রীচৈতন্য তত্ত্বের সহিত হৃদয়ের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে ঘোরতর তপস্যা করিয়াছেন। তিনি তত্ত্বের রস দিয়া হৃদয় সিদ্ধ করিতে সর্ব্বত্যাগী হইয়াছিলেন—পুরুষভাবের সম্বন্ধ সম্পূর্ণ বিসর্জ্জনে প্রকৃতি হইয়াছিলেন। চণ্ডীদাসের মত হালিসহরেও তত্ত্বের হাট বসাইতে রামপ্রসাদের আকুলতা দেখা যায়; তত্ত্ব-বস্তুর যে আর এক দিব্যরূপ, তাহাই সেখানে ফুটিয়া উঠিয়াছে শক্তি-রূপে।

ঠাকুরের জীবনে, তত্ত্বের সঙ্গে সম্বন্ধের জগৎ গড়িয়া উঠিয়াছে। দক্ষিণেশ্বরের ইহাই বিশেষত্ব।

দেখাইয়াছি—শ্রীচৈতন্যের তত্ত্ব সহজে হৃদয়ে অবতরণ করে নাই। তাঁহাকে প্রাকৃত হৃদয় উর্দ্ধে তুলিবার জন্য শচীমাতাকে পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল, বিষ্ণুপ্রিয়াকে তিনি দিব্যসঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করিতে পারেন নাই, অন্তরঙ্গ নিত্যানন্দকেও পরিত্যাগ করিতে তিনি বাধ্য হইয়াছিলেন। তত্ত্বময় হইয়া তিনি সমাধি চাহেন নাই, চাহিয়াছিলেন তত্ত্বের সম্বন্ধ দিয়া নব বৃন্দাবন রচনা করিতে। সে স্বপ্ন শ্রীচৈতন্যে সফল হইতে দেখি না। তিনি তত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছেন, সম্বন্ধের আকুলতায় উন্মাদ হইয়াছেন; কিন্তু সম্বন্ধের যে নিত্য জগৎ তাহার প্রতিষ্ঠা হয় নাই। শ্রীচৈতন্য প্রাকৃত সংসার ত্যাগ করিয়াছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ দিব্যসম্বন্ধের নূতন জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। একে যাহা অসম্পূর্ণ ছিল, অন্যে তাহা পূর্ণাঙ্গ হইয়া, ভবিষ্য জাতির জীবনে আশার স্থির সৌদামিনী জ্বালিয়া তুলিয়াছে।

তত্ত্ব, তত্ত্বের সহিত জীবের সম্বন্ধ ও তাহার লীলা-মূর্ত্তি—এই তিনটি স্তরে জগতের জীবন সার্থক হইতে চাহে। ভারতে তত্ত্ববস্তু সিদ্ধ হইয়াছে; ঠাকুর হৃদয়-সম্বন্ধ রূপান্তরিত করিয়াছেন; কিন্তু জীবনের দিব্য রূপ, ইহার যে ব্যবহারিকতা, যে আচার ও প্রকাশের ভঙ্গী, তাহার কোন আদর্শ তো তিনি টানিয়া দেখাইলেন না! তত্ত্বের সহিত হৃদয়ের সম্বন্ধ স্থির হইলেই জীবনের সিদ্ধ ছন্দঃ প্রকাশ পায় না। ঠাকুর সাধনায় অপার্থিব বিভূতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁর লীলা-দেহে অপূর্ব্ব অঙ্গকান্তি পরিলক্ষ্য করিয়া তিনি এক সময়ে একান্ত মনে ইষ্টের নিকট প্রার্থনা করিতেন "মা, আমার এ বাহ্য-রূপের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, উহা লইয়া তুই আমায় আন্তরিক

আধ্যাত্মিক রূপ প্রদান কর্।" (পৃঃ ২২৮, সাধক-ভাব, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ) কেন ঠাকুর বাহিরকে এমনভাবে সংহরণ করিলেন, তাঁহার নিজের কথায় ইহার মীমাংসা পাই "যে রাম, যে কৃষ্ণ, সেই ইদানীং এই খোলটার ভিতর—তবে এবারে গুপ্তভাবে আসা" (পৃঃ ১৭০, সাধক-ভাব, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ)—সম্বন্ধের জগৎ গড়ার শুভ মুহূর্ত্ত আসিয়াছে কিনা দেখিবার জন্যই কি তাঁর এই আগমন! ইহা ছাড়া অন্য সান্ত্বনা পাওয়া যায় না। তত্ত্ব দিয়া জগৎ-রচনার সূচনা তো কোন স্মরণাতীত যুগ হইতে সুরু হইয়াছে, ত্যাগ-বৈরাগ্যের আগুনে কামনার বীজ বিশুদ্ধ হইলেও, কেন তাহা দিয়া সৃষ্টিরেখা তিনি আঁকিয়া গেলেন না—তাঁর জীবনরহস্য অবগত হইয়া, এই প্রশ্নই আমাদের অন্তর বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলে!

আমরা দেখি—ভারতের নিত্য তত্ত্বকে তিনি প্রচলিত সাধনার পথে চলিয়াই আমাদের সম্মুখে অমর করিয়া ধরিয়াছেন। ভারতের তত্ত্ব জীবনীশক্তিপূর্ণ, সুতরাং ইহার আশ্রয়েই নূতন ভারত গড়িয়া উঠিবে; তাই ঠাকুর শুধু এই নূতন সৃষ্টির ধুয়া ধরাইয়া গেলেন। ভবিষ্য ভারতের সাধনা—এই অসমাপ্ত কর্ম্মের পূর্ণতা বিধান করা। আমাদের তত্ত্বান্বেষী হইতে হইবে না—তত্ত্বের সম্বন্ধে, সঙ্ঘ-সাধনায় পদতল ঝরিয়া রক্ত বাহির করিতে হইবে না। ইহা আজ সিদ্ধ বেশেই সাধকের হৃদয় ভরাইয়া তুলে। লীলার জগৎ গড়িয়া তোলার বিশ্বকর্ম্মা হওয়ার দুর্জ্জয় তপস্যা বাকী থাকিয়া গেল—ইহাই তো সাধ্যরূপে সমস্যার সৃষ্টি করে! ঠাকুর নরদেহে ইষ্ট-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া সিদ্ধ হইলেন, তত্ত্বময়ী হৃদয়-সঙ্গিনী লাভ করিয়া সম্বন্ধের কেন্দ্র স্থাপন করিলেন, সেই কেন্দ্রকে ঘেরিয়া তত্ত্বপ্রাণ সন্তান-সঙ্ঘ গড়িয়াও, অকালে কালের গর্ভে লুকাইয়া

পড়িলেন—ইহা সত্যই গুপ্তভাবে আসার পরিচয়। অতীতের সাধনা এই দক্ষিণেশ্বরে কতখানি পরিণতি পাইয়া কতটুকু অবশেষ রাখিয়া গেল, সেই কথার সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া ঠাকুরের পুণ্যকাহিনী সমাপ্ত করিব।

বলিয়াছি—ভারতের বৈদিক যুগ বাঙ্গালী স্বভাবের মধ্য দিয়া অবিকৃত আকারে জীবনে প্রতিষ্ঠা করার সাধনা করিয়াছে। বাঙ্গালী বৈদিক সাধনায় সিদ্ধ নহে, তবে বৈদিক যুগের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হয় নাই। বেদান্তসাধনায় সিদ্ধ শ্রীমৎ তোতাপুরী ঠাকুরকে দর্শন করিয়াই চমৎকৃত হইয়াছিলেন; কেন-না, তন্ত্রপ্রাণ বঙ্গে বেদান্তের এমন উৎকৃষ্ট অধিকারী দেখিতে পাইবেন বলিয়া তিনি আশা করেন নাই। বাংলার যে সন্ন্যাস, যে গার্হস্থ্যজীবন, তাহা বৈদিক যুগের জীবনকেই সিদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ জননী, পত্নী, কিছুই পরিত্যাগ করেন নাই। কামনার বীজ যদি বিশুদ্ধ না হয়, তবেই তাহা প্রাকৃত আকার গ্রহণ করে; যদি পরিত্যক্ত হয়, তবেই জীবের লয় সিদ্ধ হয়; আর ইহা বিশুদ্ধবর্ণ হইলেই বিশুদ্ধ সৃষ্টি ফুটাইয়া তুলে। যেমন শ্রীচৈতন্য সকল সম্বন্ধ বর্জ্জন করিয়া প্রেমোন্মাদ বেশে নীলাচলে ছুটিয়া গেলেন, তাহা যে বেদান্তধর্ম্মী মায়াবাদের সন্ন্যাস নহে, ইহা বলাই বাহুল্য; আবার রামকৃষ্ণের যে সংসার-সৃষ্টি তাহাও যে কামনার প্রাকৃত রূপ নহে, সম্বন্ধ রূপান্তরিত হইয়াই নূতন আকার ধরিতে চাহিয়াছে। ইহা একটু অনুধাবন করিলেই বুঝা যায়।

তত্ত্বকে তুরীয় ক্ষেত্র হইতে নামাইয়া বাঙ্গালীই জীবনে ইহার অবতরণ ঘটাইতে চাহিয়াছে। তত্ত্ব দিয়া নূতন জগৎ গড়িতেই বাঙ্গালী তন্ত্র ও সহজিয়ার আশ্রয় লইয়াছে। বিবিধ সাধনার পথ

ধরিয়া ঠাকুর যেমন বার-বার একই সত্যে গিয়া উপনীত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ সাধনার পথ যাহাই হউক, উহা ভারতের আদর্শ ও সভ্যতাকেই প্রাপ্ত হইবে।

ভারতের সাধনার বিষয় নিরূপণ লইয়া বিচার আছে এবং উহা লাভ করার সাধনা ষড়দর্শনে নানা ছন্দে প্রকাশ পাইয়াছে; কিন্তু জীবনে অবতরণ করাইবার উহা কৌশল নহে। তত্ত্বকে তুরীয়-বস্তু রূপে রাখিয়া, প্রারব্ধ-ক্ষয়ে উহাতে লয় পাওয়াই পরম পুরুষার্থ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। এই হেতু ভারতের তত্ত্ব জীবনী-শক্তিপূর্ণ হইলেও জীবনের সহিত উহার যুক্তির কথা স্পষ্ট করিয়া কেহ বলে নাই; জীবনকে তাই অস্বীকার করিতে হইয়াছে, মায়া বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

এ কালে বোধ হয় চণ্ডীদাসই বিপরীত পথ ধরিয়া ইহা সিদ্ধ করিতে সর্ব্বপ্রথম আয়াস করিয়াছেন। তিনি তত্ত্বকে তুরীয়-বোধে গ্রহণ করেন নাই; ইহা পরিপূর্ণ রূপে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে সিদ্ধ মূর্ত্তি পরিগ্রহ না করিলেও, কৃষ্ণচন্দ্রকেই তিনি তত্ত্ব-বস্তু বলিয়া বরণ করিয়াছেন। তত্ত্বকে বস্তু-রূপে আশ্রয় করা বাঙ্গালীর কৃতিত্ব—তত্ত্ব বস্তু হইয়া নবদ্বীপে যখন দেখা দিল, তখন চণ্ডীদাসের স্বপ্ন সফল হইল। চণ্ডীদাস ছিলেন প্রবর্ত্ত, শ্রীচৈতন্য সাধক রূপে সাধিয়া তাহা সিদ্ধ করিলেন। চণ্ডীদাস গাহিয়াছিলেন:

"প্রবর্ত্ত দেহের সাধনা করিলে কোন রকম হব।
কোন কর্ম্ম যাজন করিলে কোন বৃন্দাবনে যাব॥"

নিজেই উত্তর দিয়াছেন:

"কোন বৃন্দাবনে ঈশ্বর-মানুষে মিলিত হইয়া রয়।"

যেখানে তত্ত্বের সহিত জীবন যুক্ত হয়, সেইখানেই কি নর-

নারায়ণের দিব্য মূর্ত্তি প্রকট হয় না? ঠাকুরকে দেখিলে মনে হইত "যেন পুঞ্জীভূত ধর্ম্মভাবরাশি একত্র সম্বদ্ধ হইয়া জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে, তাই আমরা তাঁহার একটা আকার ও রূপ দেখিতে পাইতেছি।" (পৃঃ ১৮, গুরুভাব পূর্ব্বার্দ্ধ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ) বেদান্তের তাৎপর্য্য তো ইহাই—"জীবঃ ব্রহ্মৈব শুদ্ধচৈতন্যং অমেয়ং" —প্রভেদ ছিল অনুভূতির কেন্দ্র লইয়া; বাংলায় ইহা জীবন-কেন্দ্রে নামাইয়া নিত্য লীলার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ভারতের ভাব ও ভাষা বাংলা দেশেই রূপে ফুটিয়াছে। গীতার ক্ষর, অক্ষর, পুরুষোত্তম তত্ত্ব অব্যক্ত অরূপ হইয়া রহে নাই; ইহা নামে, বিগ্রহে, স্ব-রূপে অভেদ হইয়া জাতির জীবন ধন্য করিয়াছে। শ্রীচৈতন্য গাহিয়াছেন:

"দেহ দেহীর, নাম নামীর, কৃষ্ণে নাহি ভেদ।
জীবের ধর্ম্ম নাম, দেহ, স্বরূপ বিভেদ।''

সাধনার সত্যকে এমন করিয়া প্রকাশ আর কোথাও কেহ করে নাই। বাংলায় এই একই সুর নানা ছন্দে ঝঙ্কার তুলিয়াছে। রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন:

"অজ্ঞানেতে বদ্ধ জীব, ভেদ ভাবে সদাশিব,
উভয়ে অভেদ পরমাত্মা-স্বরূপিণী,
মায়াতীত নিজে মায়া, উপাসনা হেতু কায়া।"

এই কায়ায় তত্ত্বপ্রতিষ্ঠা—বাঙ্গালীর অপূর্ব্ব দৃষ্টি ও সৃষ্টি। ভারতের বেদান্তে অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্বের গভীর গবেষণায় মাথা ঘুরিয়া পড়ে; এই অনির্ব্বচনীয় তত্ত্বের ঘনীভূত রূপ যদি কেহ গড়িয়া দেখায়, কাহার হৃদয় না উল্লাসে নাচিয়া উঠে? সাধনার মরুপথে পথিকের কণ্ঠ শুকাইয়াছিল, সহসা শীতল জল ঢালিয়া কে তাহাকে

তৃপ্তি দিল? একাধিক সাধকের হৃদয়-বীণায় নূতন রাগিণী ঝঙ্কার তুলিল। ভক্ত নরোত্তম গাহিলেন:

"কৃষ্ণের যতেক খেলা
সর্ব্বোত্তম নর-লীলা,
নরদেহে তাহার স্বরূপ।"

ঠাকুরও ছাড়িয়া কথা কহিলেন না, বলিলেন—"মানুষে ইষ্টবুদ্ধি ঠিক হ'লে তবে ভগবান্-লাভ হয়।" ইহা তিনি নিজের জীবনে সিদ্ধ করিয়া ভক্তদের মাথা নরনারায়ণের চরণে নত করাইয়া, তত্ত্বকে বস্তুতন্ত্র করিয়া তবে নিশ্চিন্ত হইলেন।

তত্ত্বময় জীবন বলিয়াই, জীবনের সম্বন্ধ—মায়া নহে। তত্ত্ব নিত্য বলিয়া জীবন নিত্য, জীবনের আশ্রয় দেহও নিত্য। নিত্য সম্বন্ধ—এই হেতু আকস্মিক সৃষ্টি নহে, ইহা কল্পবিধৃত বস্তু। এইখানে আসিয়া ঠাকুর লীলা শেষ করিলেন। সম্বন্ধের যে জগৎ, সেখানকার ছন্দোনির্ণয় করা হইল না। তিনি জীবনের সর্ব্ববিধ সমস্যা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু সমাধান করেন নাই। তাঁহার মধ্যে সামাজিকতার ছোট-ছোট সাধারণ আচারগুলিও নূতন সার্থকতায় স্থান পাইয়াছিল। স্বামী ব্রহ্মানন্দের বালিকা পত্নীকে মন্দিরে শ্রীমার নিকট পাঠাইয়া, তিনি টাকা দিয়া পুত্রবধূর মুখদর্শনের আদেশ দিয়াছিলেন। তিনি নিজ পত্নীর সহিত দিব্য জীবনের স্তরে দাঁড়াইয়া কিরূপ আচরণ করিবেন, তাহাও সমস্যার বিষয় হইয়াছিল। ভারতে ইস্‌লাম ও খৃষ্টান সভ্যতার বীজ নিজের মধ্যে সংহরণ করিয়া, ইহার মীমাংসা কি হইবে, তাহাও তিনি ভাবিয়াছিলেন। যে কামবীজ একদিন ইষ্টভক্তিরূপে জীবনকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, শ্রীশ্রীজগদম্বার চরণে তাহা বার-বার উৎসর্গ করিয়াও বিলীন হইল না;

তিনি বুঝিলেন—তত্ত্ব যেমন নিত্য, কামবীজেরও তেমন নিত্যতা আছে। এ কাম—ঈশ্বর-কাম! ধন, মান, নাম, যশঃ, পৃথিবীর ভোগাকাঙ্ক্ষা বহু পূর্ব্বে তিনি ইষ্টে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন; বুদ্ধি চিত্ত, অহঙ্কারাদি সকলকেও উহার করাল মুখে একে-একে আহুতি দিয়াছেন; "তবুও বাকী থাকিয়া গেল, পুনঃ কামনা হইল, বিবিধ সাধন-পথে শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে দেখিবার বাসনা—তাহাও তিনি নিঃশেষে তর্পণ করিলেন।" (পৃঃ ৩৮৩, সাধক-ভাব, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ) কিন্তু কাম-বীজ পুড়িয়া ছাই হওয়ার বস্তু নয়, আহুতিতে-আহুতিতে ইহা বিশুদ্ধ বর্ণ লইয়াই প্রকাশ পায়। তিনি কিসের জন্য "বাবু-দিগের কুটী'র উপরের ছাদে যাইয়া হৃদয়ের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ক্রন্দন করিতে-করিতে উচ্চৈঃস্বরে—'তোরা সব কে কোথায় আছিস্, আয় রে, তোদের আর না দেখে থাকৃতে পারৃছি না রে' এই বলিয়া চীৎকার করিতেন? এই কাম-বীজেই রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের উৎপত্তি। বাংলায় তাই সঙ্ঘসৃষ্টিও সাধ্য নহে, সিদ্ধ বস্তুরূপে সহজ হইয়াছে।

কিন্তু যে সকল জাতীয় সমস্যা লইয়া তিনি নাড়াচাড়া করিলেন, তাহার ত সমাধান হইল না! সঙ্ঘজননীকে নব বৈধব্য-বেশ দিয়া তিনি লীলা সম্বরণ করিলেন। অতীত ভারতের আদর্শ এই রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘকে পাইয়া বসিল; কিন্তু স্বামীজী সিংহদর্পে তাহা রূপান্তরিত করিলেন। ঠাকুরের সন্তানগণ তো কাম-বীজের লয় করিতে পারেন না! তাই দক্ষিণেশ্বরের সন্ন্যাসী বুকের দরদ পৃথিবীর বুকেই নামাইয়াছিলেন। অবতরণের লীলা কঠোর সন্ন্যাস-জীবনেও রূপ লইয়া দেখা দিল। স্বামীজির চক্ষে ভারতের দৈন্য দূর করার ব্যথা অশ্রু-রূপে অনর্গল বহিল। সৃষ্টির উপর এই মমতাই তো জগৎকে ধন্য করে! অধিরূঢ় ভাব অবতরণের প্রবাহ

রচনা করিয়াছে সৃষ্টির সূচনায়; কিন্তু ইহা চিদ্‌ঘনমূর্ত্তিতে ধরাকে দিব্য চেতনায় পূর্ণ করে নাই। বাংলায় এই অবতরণের লীলাই অঙ্কুরিত হইয়াছে—ঠাকুরের দীক্ষায় সাধু নাগমহাশয়ের জীবনে তারই জ্বলন্ত প্রমাণ আমরা দেখিতে পাই।

ঠাকুর কাম ত্যাগ করিয়াছেন; কিন্তু উহার রূপান্তর করিয়া পুনঃ-গ্রহণে সৃষ্টির দিব্য ছাঁচ রক্ষা করিয়াছেন। ঠাকুর জাতীয়তার সকল দিক্‌ই স্পর্শ করিয়াছেন; কিন্তু কাঞ্চন আদৌ স্পর্শ করেন নাই কেন? কামের রূপান্তর আছে, কাঞ্চনের কি নাই? অসুরের ঐশ্বর্য্য কুবেরের সম্পদ্‌রূপে দিব্য হওয়ার কি সম্ভব নহে? জগৎকে সিদ্ধ করিতে হইলে, শক্তির এই উভয় মূর্ত্তিরই রূপান্তর প্রয়োজন হইবে।

তাঁহার কথাই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিব। তিনি এবার গুপ্ত-ভাবেই আসিয়াছিলেন, মাত্র প্রকাশের সঙ্কেতটুকু দিয়া গিয়াছেন। শুনা যায়, তিনি নাকি আবার দুইশত বৎসর পরে আসিবেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। জগতের রূপান্তর সাধনের এই সময় খুব দীর্ঘ বলিয়া মনে হয় না। তত্ত্বকে পাওয়ার জন্য ভারত মরণকে ভয় করে নাই, একটা বিশাল জাতির মৃত্যু ঘটিয়াছে—চিরদিনের এই প্রশ্নের আজিও মীমাংসা হয় নাই। "মরিয়া দোঁহাতে কিরূপ হব?"—চণ্ডীদাস যে উত্তর দিয়াছেন, তাহাতে তত্ত্বনির্ণয়ের সঙ্কেত মিলে। নবদ্বীপচন্দ্র তত্ত্বের সহিত সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে গিয়াই লীলা সম্বরণ করিলেন; ঠাকুর তত্ত্ব ও সম্বন্ধ জীবনে প্রতিষ্ঠা করিয়া, লীলার ইঙ্গিতটুকুই দিয়া গেলেন। এক্ষণে দিব্য জীবনের আচার কিরূপ হইবে, তাহাই সমস্যা।

ঈশ্বর-সম্বন্ধের মানুষ যাহারা, তাহাদের রীতি-নীতি, ধর্ম্ম, সমাজ, তাহাদের ভোগ, সুখ, ঐশ্বর্য্য, সবই নূতন ভঙ্গীতে প্রকাশ পাইবে।

"না জানিয়ে তত্ত্ব কেমনে হইবে পার!" কিন্তু তত্ত্ব-বস্তু আর তো অনাবিষ্কৃত নহে; তত্ত্বের সহিত জীবের সম্বন্ধও তো স্থির হইয়াছে; এক্ষণে সেই লীলার জগৎ কে গড়িয়া তুলিবে? দুইশত বৎসর জাতি কি প্রতীক্ষায় অতিবাহিত করিবে? দীক্ষার বীর্য্য কি জীবন্ত শক্তিময় নহে? তাই তো নবীনের কণ্ঠে প্রশ্ন—"ততঃ কিম্?" নূতন বর্ণ, নূতন ধর্ম্ম, নূতন সন্ন্যাস, নূতন গার্হস্থ্যের রূপ লইয়া নূতন জগৎ গড়ার প্রেরণাই ঠাকুরের মহাদান—

"চিচ্ছক্তি সম্পত্ত্যের 'ষড়ৈশ্বর্য্য' নাম।
সেই 'স্বারাজ্যলক্ষ্মী' করে নিত্য পূর্ণকাম।"

পূর্ণকাম ভারতের নব রাজ্যই সাধকের বৃন্দাবন, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের 'ধর্ম্মরাজ্য'। সেখানে জনক, অজাতশত্রুর মত রাজর্ষিবৃন্দকে ঘিরিয়া শুক, সনক, সনন্দের মত নিত্য সন্ন্যাসীর থাক নিত্য বিরাজ করিবে; সেখানে গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম ছাড়িয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্মকে শ্রেয়ঃ করার কথা থাকিবে না; "এক কৃষ্ণ-দেহ হইতে সবার প্রকাশ" বলিয়া কেহ তত্ত্ব হইতে নিজেকে স্বতন্ত্র মনে করিবে না। এই ঈশ্বরকোটীর জাতি লীলার জগৎরূপে ভারতে ভাগবত রাজ্য সংস্থাপন করিবে। দক্ষিণেশ্বরে এই দেবজাতিগঠনের ভিত্তি সূত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাই ইহা নবজাতির পরম তীর্থ।

* *
*